নবম অধ্যায়

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ

১

মর্টন স্কুল। শ্রীম চারতলায় ছাদে বসা উত্তরাস্য। আজ ১৫ই মার্চ, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। জগবন্ধু আসিয়াছেন, শ্রীমকে দর্শন করিয়া বিদায় নিবেন। তিনি দেওঘর বিদ্যাপীঠে যাইতেছেন সেবাকর্ম নিয়া। এখন অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা।

শ্রীম সস্নেহে জগবন্ধুকে তাঁহার নিজের পাশে জোড়া বেঞ্চিতে বসাইলেন। কুশল প্রশ্নাদির পর কথাবার্তা হইতেছে।

জগবন্ধু — গত কয়েকটা দিনের ডায়েরী এবং পুরানো ডায়েরীর কতক অংশ আপনাকে শোনান হয় নাই। আজ শোনাব বলে সঙ্গে এনেছি।

শ্রীম — হাঁ, শোনান শোনান। আমাদেরও সাধুদর্শন হয়ে যাবে। সাধু ডায়েরী পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন।

বেলুড় মঠ, ১২ই মার্চ, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার। সকাল সাড়ে সাতটা। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ বারান্দায় পায়চারী করিতেছেন। গায়ে চাঁপা রং-এর পাঞ্জাবী। পায়ে ভেলভেটের চটি। পায়চারী করিতেছেন আর বলিতেছেন, দুর্গা, শিবদুর্গা, শিবদুর্গা। ঠাকুরের এই দুর্গানাম করলে সব আপদ কেটে যায়। বলিয়াই ঠাকুরের এই গানটি গাহিতেছেন —

বল রে বল সবে শ্রীদুর্গানাম।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে যে বা পথ চলে যায়।
শূলহস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায়॥

এখন শ্রীমহাপুরুষ চেয়ারে বসিলেন প্যাসেজের মুখে পূর্ব-দক্ষিণমুখী হইয়া। প্রসন্নবদন, স্মিতহাস্যে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। খোকা মহারাজ বসা ইজি-চেয়ারে রেলিং-এর গায়ে। তাঁহার সহিত কথা হইতেছে। স্বামীজীর ঘরের সেবক এই দৃশ্য দর্শন করিয়া নিচে যাইতেছেন।

আজ চাঁচর। ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৩৬ সাল, বৃহস্পতিবার। ১৩ই মার্চ, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ। সন্ধ্যার পর সাড়ে সাতটা হইবে। শ্রীমহাপুরুষ রেলিং-এ ঝুঁকিয়া চাঁচর দর্শন করিতেছেন দক্ষিণ দিকে গঙ্গাতীরে চন্দনতলায়। রেলিং-এর উত্তর দিক হইতে দ্বিতীয় ব্লকে দাঁড়ান। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, তত উজ্জ্বল নয়। তবুও চাঁচর গৃহ দেখা যাইতেছে। এখনও অগ্নিসংযোগ হয় নাই। শ্রীমহাপুরুষের পশ্চাতে অনঙ্গ, মতি, রমেন ও জগবন্ধু। বলিতেছেন, দেখ ঐ দেখা যাচেছ একটু, অন্ধকার। গোবিন্দায় নমঃ, কৃষ্ণায় নমঃ।

নয়টা দশটার সময় শ্রীমহাপুরুষ নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। সিঁড়ির উপর একটি সাধুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শরীর এমন রোগা হয়ে যাচেছ কেন? সাধু উত্তর করিলেন, পিঠের pain-টা (ব্যথা) রয়েছে বলে। Strain (অধিক খাটুনী) করতে পারি না — body, brain (দেহ ও মস্তিষ্ক) দু'টোই। অতি সকরুণভাবে মহাপুরুষ মহারাজ উত্তর করিলেন, না বাবা, করো না।

পরদিন দোল। ১৪ই মার্চ ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। বেলা সাড়ে দশটা। স্বামীজীর সেবক সাধু ঠাকুর দেবতাদের সকলকে আবীর দিয়া শ্রীমহাপুরুষের কাছে আসিয়াছেন। তিনি ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন। কেদার মেঝেতে বসা। আবীর দেখিয়া বলিলেন, না বাবা। সেবক মেঝেতে পায়ের কাছে দুই বিন্দু সমর্পণ করিলেন। মহাপুরুষ আনন্দে বলিলেন, হাঁ তাই দাও।

মহাপুরুষ বারান্দায় যাইতেছেন। সঙ্গে একটি সাধু পশ্চাতে। প্যাসেজে সাধু বলিলেন, দেওঘর বিদ্যাপীঠে যেতে বলছেন ওঁরা (কর্তৃপক্ষ)। মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? সাধু বলিলেন, একটু পড়াতে হবে। আর ভাল জায়গা, যদি একটু change (বায়ু পরিবর্তন) হয়। মহাপুরুষ বলিলেন, হাঁ জায়গা ভাল। তবে বড় গরম। তবে তোমার মাদ্রাজের গরম সওয়া আছে।

মহাপুরুষ বারান্দায় পায়চারী করিতেছেন। সাধুর কথা শুনিয়া ভাবিত হইয়াছেন। এই সাধু রুগ্ন শরীর লইয়া মাদ্রাজ হইতে এখানে আসিয়াছেন। বিশেষ কাজ করিলেই রোগবৃদ্ধি হয়। এখানে সামান্য একটু কাজ করেন, স্বামীজীর ঘরের সেবা।

একটু পর মহাপুরুষ চিন্তিত হইয়া বলিলেন দৃঢ়ভাবে, হাঁ, এইটুকু কাজ। (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া) এইটুকু কাজ — বেশী নয়।

শ্রীম অন্তেবাসীকে বলিলেন, কই পুরানো ডায়েরী? বলেছিলে, মহাপুরুষ মহারাজের পুরী ও ভুবনেশ্বর দর্শনের কথা আছে। ওটা পড়ে শোনাও।

এখন পুরানো ডায়েরী পাঠ চলিতেছে। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ মিশনের কর্মোপলক্ষ্যে মাদ্রাজ যাইতেছেন। বেলুড় মঠ হইতে আসিয়া তিনি কয়েকদিন ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে রহিয়াছেন। আজ সদলবলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে আসিয়াছেন। আজ ৫ মে, ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ, বৈশাখের ২২ তারিখ, ১৩৩২ সাল, বুধবার।

শ্রীমহাপুরুষ রেলস্টেশন হইতে মোটরে করিয়া সোজা অরুণস্তম্ভের নিকট মন্দিরদ্বারে উপস্থিত। সঙ্গীগণ কেহ মোটরে, কেহ ঘোড়ার গাড়িতে আসিলেন। এখন প্রায় সাতটা।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে অভ্যর্থনার জন্য অরুণস্তম্ভের নিকট জগবন্ধু, গদাধর ও মহেশচৈতন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ইঁহারা সকলে ক্ষেত্রবাসী। স্বামী সিদ্ধানন্দ ও ব্রহ্মচারী গোপালও ক্ষেত্রবাসী। উনি মোটর হইতে নামিয়াই বলিলেন, এই যে জগবন্ধু, আসল জগবন্ধুকে গিয়ে দেখি চল।

প্রণাম সম্ভাষণাদির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ভুবনেশ্বর মঠের অধ্যক্ষ। তিনি ও স্বামী শর্বানন্দ আর স্বামী যতীশ্বরানন্দ একই মোটরে আসিয়াছেন। পরে আসিলেন স্বামী গঙ্গেশানন্দ, অপূর্বানন্দ, স্বামী সিদ্ধানন্দ, চিনু, মণীন্দ্র, তাম্বি ও বর্ধমানের ডাক্তার। স্বামী সিদ্ধানন্দ স্টেশনে গিয়া লইয়া আসিয়াছেন। লক্ষ্মণ ও গোপাল আসিয়া এইসঙ্গে মিলিত হইলেন।

শ্রীমহাপুরুষ ফটক দিয়া প্রবেশ করিলেন, পশ্চাতে সকলে। চৌকিদার শর্বানন্দজীকে কোমরের চামড়ার বেল্ট খুলিয়া যাইতে বলিল। মন্দিরের মধ্যে চামড়ার প্রবেশ নিষিদ্ধ। মন্দিরের ম্যানেজারের নিকট হইতে খাতিরদারী ‘পাশ’ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন ক্ষেত্রবাসী সাধু ও ব্রহ্মচারীগণ। কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন — না, ভগবানকে সকলের

সঙ্গে দর্শন করতে হয় দীনভাবে।

নাটমন্দিরের দক্ষিণ দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া শয়নমন্দির পার হইয়া রত্নবেদীতে গর্ভগৃহে শ্রীমহাপুরুষ সদলে উপস্থিত। খুব ভীড়, ঘৃতের ক্ষীণোজ্জ্বল দীপের সহিত যেন অন্ধকারের সংগ্রাম চলিতেছে। মঠের পাণ্ডারা দীপ হাতে লইয়া অগ্রে যাইতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ ও সঙ্গীগণ পিছনে পিছনে চলিয়া রত্নবেদীতে অবস্থিত শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। গ্রীষ্মকাল, তাহার উপর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, দীপের ধুম ও অসংখ্য লোকের নিঃশ্বাসে মন্দিরাভ্যন্তর বেশ উষ্ণ হইয়াছে। শ্রীমহাপুরুষ এক কোণে একটু দাঁড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পরনে মুক্তকচ্ছ দুই ভাঁজ ধুতি, গায়ে মাদ্রাজী চাদর। ঘামে সব ভিজিয়া গিয়াছে।

এইবার শয়নমন্দিরের দরজা দিয়া বাহিরে আসিয়া বিমলাদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। বিমলাপীঠ একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম। শ্রীমহাপুরুষের ইচ্ছায় একটি চম্পক পুষ্পের মালা মায়ের গলায় পরাইয়া দিলেন। প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিয়া সোজা লক্ষ্মীমন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সকল মন্দিরেই যথেষ্ট প্রণামী দিয়া প্রণাম করিলেন। পাণ্ডাগণও নানাবিধ নির্মাল্য প্রদান করিলেন। শ্রীমহাপুরুষের মন অন্তর্মুখীন — তিনি নির্বাক দর্শন, প্রণাম ও পরিক্রমা করিতেছেন। লক্ষ্মীর নাটমন্দিরের কোণে ক্ষণকালের জন্য বসিলেন। এই মন্দিরে বসিয়া দর্শনকারী ভক্তগণ ক্ষণকাল ঈশ্বরচিন্তা করেন। তারপর আনন্দবাজারে প্রবেশ করেন। এইস্থানে মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয়। স্পর্শদোষ নাই এখানে। উচ্ছিষ্ট দোষও নাই। এখন মহাপুরুষ আনন্দবাজারের ভিতর দিয়া ফটকের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীমহাপুরুষ কয়েকজনকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া মোটরে শ্রীহরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী উকিলের বাড়ি রওনা হইলেন। হরেন্দ্রবাবু শ্রীমহাপুরুষের মন্ত্রশিষ্য। তাঁহার বাড়ি শশী নিকেতনের পাশে সমুদ্রের পথে।

হরেনবাবুর বাড়ি। দক্ষিণের বারান্দার পূর্ব পার্শ্বে শ্রীমহাপুরুষ চেয়ারে বসা দক্ষিণাস্য — তামাক খাইতেছেন গড়গড়ায়। এখন সকাল সাড়ে আটটা। সাধু ও ভক্তগণ কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া আছেন। সাধুদের জলযোগ হইতেছে ভিতরে। শ্রীমহাপুরুষ ঠাকুরের পবিত্র স্মৃতিকথার অবতারণা করিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ — (সকলের প্রতি) স্বামীজীকে ঠাকুর মহাপ্রসাদ খেতে বলতেন। নিজে রোজ একদানা 'আটকে' মহাপ্রসাদ খেতেন। স্বামীজী বলতেন, এতে কি হবে? বিশ্বাস করতেন না। তখন ঠাকুর বলতেন, আরে দ্রব্যগুণ তো আছে — বিষ খেলে তো তার ফল হবে — খা। মন যখন খারাপ হবে তখন খাবে একটু মহাপ্রসাদ। দ্রব্যগুণের কথায় স্বামীজীর বিশ্বাস হয়।

আমার বাবা, জগন্নাথের উপর ভক্তি ছিল না, অভক্তিও ছিল না। একবার এই সামনের বাড়িতে 'শশী নিকেতনে', মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বাস করতেন। আমি সকালে বেলুড় মঠ থেকে এসেছি ট্রেনে, তাঁর কাছে একটা কাজ ছিল, সই করাতে হবে একটা দলিলে। কাজ হয়ে গেছে। ভাবছি, সন্ধ্যের ট্রেনে ফিরবো। মহারাজ বললেন — তারকদা, একবার জগন্নাথদর্শন করে যাবেন না? এত দূর এলেন। আমি ঐ বাবা — বললাম, আমার ভক্তিও নাই, অভক্তিও নাই জগন্নাথে। তবে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যেখানে যাবে আমি যাব। তারপর মহারাজ সঙ্গে গেলেন। গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করতেই মহারাজের মন বিলীন হয়ে গেল। ভাবসমাধি হয়েছিল। আমার মনও খুব উঁচুতে উঠে গেল। বাইরের কোন জ্ঞান ছিল না — খুব ধ্যান হল। তখন থেকেই বুঝলাম, এখানে ভগবানের বিশেষ শক্তি রয়েছে — বিশেষ আবির্ভাব! তাই তো চৈতন্যদেব এখানে অতদিন ছিলেন।

২

শ্রীমহাপুরুষ এবার উঠিয়া গিয়া হলঘরে তক্তপোষের উপর বসিলেন। মাঝে মাঝে গড়গড়ার নলে মুখ সংলগ্ন করিয়া এক আধটা টান দিতেছেন। মন অন্তর্মুখ। কথা দিয়া অন্তরের ভাবের প্রকাশ হইতেছে।

শ্রীমহাপুরুষ (সাধু ও ভক্তদের প্রতি) — রাস্তায় আসতে আসতে দূর থেকে জগন্নাথের ধ্বজা দেখে চৈতন্যদেব একেবারে ভাবে বিহ্বল হয়ে যেতেন। ঠাকুরের, জগন্নাথের নাম করতেই বা শুনলেই, সমাধি হয়ে যেত। বলরামবাবুরা অনেকবার তা দেখেছেন। তাঁদের বাড়িতে জগন্নাথের নিত্যপূজা আছে। বলতেন, ওখানে গেলে আর এ শরীর

থাকবে না। ঠাকুর জগন্নাথধামে আসেন নাই তাই। গয়াতেও তাই।

একজন ভক্ত — ‘রামকৃষ্ণ’ নাম কি করে হলো?

শ্রীমহাপুরুষ — স্বামীজী surmise (অনুমান) করতেন, বোধহয় তোতাপুরী দিয়েছেন। বলতেন, সন্ন্যাসের তো একটা নাম হবে। বোধহয় এই নাম দিয়েছিলেন।

ভক্ত — শশীবাবু ঠাকুরের জীবনীতে অন্যরূপ লিখেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ — শশীবাবু নিজের opinion (মত) লিখেছেন। তা খুব পারেন। কতজনে তো কত কথা লিখছেন। কথামৃত লিখেছেন মাস্টারমশায়। একেবারে ঠাকুরের মুখ থেকে শুনে। শরৎ মহারাজও লিখেছেন ঠাকুরের কাছ থেকে, ‘প্লাস’ (আর) মার মুখ থেকে শুনে। আর আমরা যা বলি, বিশেষতঃ আমি, সবই তাঁর মুখ থেকে শুনে।

এখন বেলা এগারটা। শ্রীমহাপুরুষ স্নান করিতে গেলেন।

অপরাহ্ন চারিটা। শ্রীমহাপুরুষ বিশ্রামান্তে হলঘরে আসিয়া বসিয়াছেন, উত্তরের দরজার পূর্ব পাশে দেয়ালের গায়ে দক্ষিণাস্য। তামাক খাইতেছেন, আশেপাশে অনেক সাধু ও ভক্ত আছেন। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। শরীর শীর্ণ, সত্তরের উপরে বয়স। পরনে ময়লা সাদাপেড়ে ধুতি। তিনি মহাপুরুষকে নমস্কার করিলেন না দেখিয়া সকলে অবাক। শ্রীমহাপুরুষ দেহ উন্নত ও চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আশ্চর্যবৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি?

বৃদ্ধা মহিলা বলিলেন, তুমি চিনতে পারছ না — তুমি তারক? (সকলের বিস্ময়)।

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ, তুমি কে? (পরিচয় বলিলে, সহাস্যে সকলের প্রতি) আমার জ্যেঠতুতো জ্যেষ্ঠা ভগিনী। (মহিলার প্রতি) আজ প্রায় ষাট বছর পর তোমার সঙ্গে দেখা।

বৃদ্ধা — বরানগরে একবার দেখেছিলাম।

শ্রীমহাপুরুষ — তা হলে পঁয়ত্রিশ বছর পর।

বৃদ্ধা — কাশীতে একবার গিছলাম দেখা হয় নাই।

শ্রীমহাপুরুষ — শুনেছিলাম। কেষ্টলাল বলেছিল, তুমি এখানে রয়েছ। শরীরটা ভাল আছে তো?

বৃদ্ধা — মাথায় যন্ত্রণা হয়।

শ্রীমহাপুরুষ — তা একটু তিলের তেল দেবে। সরষের তেলে কিছু হবে না।

বৃদ্ধা আপনার জীর্ণ শীর্ণ বাহুদ্বয় দেখাইতেছেন। আর অনিমেষ নয়নে ছোট ভাইকে দর্শন করিতেছেন তাঁহার সমস্ত মন আর প্রাণ স্নেহসিক্ত করিয়া।

বৃদ্ধা — তুমি সেই ছোট্ট তারকটি ছিলে, আর এখন হয়েছ মহারাজ।

শ্রীমহারাজ — আমি তোমার কাছে এখনও তোমার সেই ছোট্ট ভাইটিই। যাদের মহারাজ, তাদের মহারাজ।

বৃদ্ধা — তোমার কপালে সেই দাগটি এখনও রয়েছে দেখছি। তাই দেখে চিনলাম। অন্য আত্মীয়দের কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় নি?

শ্রীমহাপুরুষ — না, আমি কোথাও যাই না। কে একবার নিমন্ত্রণ করেছিল। আমি বললাম, যদি ভগবানের কোনও একটা উৎসব হয়, কোনও পূজা কি নিদেন ভাগবত পাঠ, তবে যেতে পারি। তা নইলে নয়। এমনি নিমন্ত্রণ খাওয়া হবে না। অমুক (কনিষ্ঠা ভগিনী) আত্মীয়তা দেখিয়ে কাশী সেবাশ্রম থেকে দারিদ্রের সাহায্য নিতে এসেছিল। আমি বললুম, সমস্ত জগৎই আমার ভাইবোন, একা তুমি কি আমার বোন? সকল মানুষই আমার ভাইবোন, মা বাপ। সাধুর আবার কে কি? — 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। তা তাকে বললুম, ঠাকুরের ওখানে দশজন গরীবে পায়, তুমি চাও তো পেতে পার। ভাই বলে পরিচয় কেন? ভাই, বোন এসব যে মায়া!

হরেনবাবু — পিসিমার একটু শুচিবায়ু আছে (হরেন বুড়িকে দেখাশোনা করেন)।

শ্রীমহাপুরুষ — (বৃদ্ধাকে) শুচি ভাল, শুচিবায়ু ভাল না। পরিষ্কার পরিচছন্ন থাকা বেশ।

বৃদ্ধা — তোমার সম্বন্ধে যা বলেছিল কালীঘাটের সাধু, তাই হলো। বলেছিল, 'হয় রাজা হবে, না হয়তো বের হয়ে চলে যাবে, নয়তো খুব লম্পট হবে'।

শ্রীমহাপুরুষ — (বৃদ্ধার মুখ থেকে কথা কাড়িয়া লইয়া) রাজাও

আবার হয়? আমায় যদি কেউ বলে রাজা হও, আমি জোড় হাতে বলি, না বাবা। আমার এটাই ঠিক — সাধু হওয়া, বের হয়ে যাওয়া। রাজা! রাম রাম!

হাঁ, সে সাধুর কিছু সিদ্ধাই ছিল, তান্ত্রিক। তাঁর ওখানে কলসী থেকে একটা গাছ বেরিয়েছিল — একতলা সমান।

অপরাহ্ন পাঁচটা। পুরীর প্রধান উকীল বিধুভূষণ ব্যানার্জী শ্রীমহাপুরুষকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে জামাতা, উকীল জিতেন্দ্রনাথ মুখার্জী, ভাগিনেয় ও কনিষ্ঠ পুত্র হিমাদ্রি (রবি)। পুরীবাসের সহায়করূপে একটি ভক্ত হিমাদ্রির গৃহশিক্ষক। স্বামী সিদ্ধানন্দ সকলকে পরিচয় করাইবার প্রসঙ্গে একটি ভক্তকে দেখাইয়া বলিলেন, ‘এঁর ছাত্র এ ছেলেটি (হিমাদ্রি)। শ্রীমহাপুরুষ ছেলেটিকে এক দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। ছেলেটির বয়স চৌদ্দ, গৌরবর্ণ, অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে।

এই শিক্ষক ভক্তটি কলিকাতা হইতে মার্চ মাসে আসিবার সময় মঠে শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ ও শ্রীম-র সহিত পরামর্শ করিয়া ও তাঁহাদের অনুমতি লইয়া এখানে আসিয়াছেন, এবং ঐ গৃহশিক্ষকতা লইয়াছেন। শ্রীমহাপুরুষ উৎসাহ দিয়া বলিয়াছিলেন, খুব ভাল, যাও — অমন তীর্থ! আর জাগ্রত ভগবান জগন্নাথ। যখন মন খারাপ হবে তখন গর্ভমন্দিরে গিয়ে জপ করবে। ওখানে একটা মহাশক্তির আবির্ভাব রয়েছে। যাও, ভগবানের খুব কৃপা অমন স্থানে বাস করা। মাঝে মাঝে চিঠি লিখো। শ্রীম বলিয়াছেন, এতে আবার জিজ্ঞাসা — শুভস্য শীঘ্রম্। মহাতীর্থে বাস, জগন্নাথ দর্শন, মহাপ্রসাদ সেবন, সমুদ্র দর্শন, আবার চৈতন্যদেবের পুণ্যস্মৃতি! ঠাকুরই তো চৈতন্য! মহাভাবে ছিলেন একটানা বার বছর। সেই সব ভাবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রয়েছে। ঠাকুর নিজে বলেছেন, আমিই গৌরাঙ্গ, আমিই জগন্নাথ। তাইতো ওখানে যেতে পারতেন না। গেলে, গৌরলীলার কথা স্মরণ হয়ে মহাভাবে দেহত্যাগ হবে। আমারই তো যেতে ইচেছ হচেছ আপনার সঙ্গে। আর অমন সুবিধা হয়েছে — একটা থাকা খাওয়ার স্থান হয়েছে। যান, আমার জন্যও ঐরূপ একটা সুবিধা করে দিন। দেখবেন। টাকা দিয়ে দেওয়া গেল — আহার পাওয়া যাবে। রান্নার ল্যাঠা বড্ড বেশী। ঐতে দিন চলে যায়।

শ্রীমহাপুরুষ কিশোর বালকটিকে দেখিয়া প্রসন্ন হইয়াছেন। তাই তাহাকে কৃপা করিয়া দুই চারিটি কথা বলিতেছেন। কিন্তু লক্ষ্য তার পিতা। বলিলেন, খুব ভাল লোক পেয়েছ। লেখাপড়া বেশ জানে আর খুব পবিত্র। সৎ লোক পাওয়া, এমন সঙ্গ — পাওয়া যায় না, বহু ভাগ্যে পাওয়া যায়।

কথা সমাপ্ত হইতেই একটি তিন বছরের শিশু আসিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল। শ্রীমহাপুরুষ সহাস্যে বলিলেন, দেখে দেখে এসব হয়। বাপ-মা ঠাকুরঘরে নিত্য সকাল-সন্ধ্যায় বসলে তাদের দেখে ছেলেদেরও বসতে ইচ্ছা হয়। তাই বাড়িতে ঠাকুরঘর রাখা ভাল। ছেলেদের ঠাকুরের কাজ একটু একটু করানো আরও ভাল।

(বৃদ্ধা ভগিনীকে লক্ষ্য করিয়া বিধুবাবু প্রভৃতির প্রতি) — মহামায়ার প্রভাবে তো সবাই কাজ করছে। তবে এই দেখতে হবে, তাঁর উপর একটু ভক্তি আছে কিনা। ভক্তি থাকলে তার মার নেই — যেমন খুঁটি পেলে। এখন ঐ ধরে চারদিকে ঘোরা। ভক্তি না থাকলে কিছু হলো না।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। পুরীর রেলস্টেশন। শ্রীমহাপুরুষ ও পার্টি ভুবনেশ্বর যাইতেছেন কলিকাতা এক্সপ্রেসে। একটি ভক্ত ভুবনেশ্বর মঠে যাইবার অনুমতি চাহিলেন। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, হাঁ, চল। যাবে বই কি, চল চল। শ্রীমহাপুরুষ আরও কয়েকজন সাধুকে লইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে বসিয়াছেন। খুর্দা জংশনে গাড়ি থামিলে, ভক্ত ও রেলকর্মী রাজেন আসিয়া গাড়িতেই ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার স্ত্রী অসুস্থা, খুব কষ্ট, সংসার অচল। শ্রীমহাপুরুষ বেশ হাসিখুশির সহিত কথাবার্তা কহিতেছিলেন। ভক্তের দুঃখের কথা শুনিয়া যেন মায়ের মত সহানুভূতিতে দুঃখময় ভাব ধারণ করিলেন। কি মন ইঁহাদের। যেন ব্লটিং পেপার। সান্ত্বনা দিয়া মাত্র কয়েকটি কথা বলিলেন, সংসারের এই হাল, বাবা। ঠাকুরকে বল, তিনি দুঃখ দূর করবেন। নিজে অন্তর্মুখ হইয়া ঠাকুরকে যেন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

গাড়ী ভুবনেশ্বর থামিলে স্টেশনমাস্টার আসিয়া শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে নামাইয়া একটি নূতন কাঠের যষ্টি উপহার দিলেন। মঠ হইতেও সনৎ

মহারাজ ও ভবানী মহারাজ রিক্সা লইয়া আসিয়াছেন। শ্রীমহাপুরুষ 'শ্রীমহারাজের' ব্যবহৃত রিক্সাতে আরোহণ করিলেন। অপর সকলে পদব্রজে রওনা হইলেন। আধ মাইল রাস্তা, মঠে পৌঁছিতে রাত্রি নয়টা বাজিল।

ঠাকুরের ভোগের পর শয়ন হইয়াছে। সাধু ভক্তগণের প্রসাদ পাইতে বেশী রাত্রি হইয়া গেল। ঐ সঙ্গে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ সকলে গ্রহণ করিলেন। শ্রীমহাপুরুষ শয়ন করিয়াছেন হলের পূর্বধারের ঘরে।

পরদিন ৬ই মে ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ। বৃহস্পতিবার সকাল ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ নিজকক্ষে চেয়ারে বসিয়া আছেন তামাক খাইতেছেন। ঘরে লক্ষ্মণ আছে। আর একটি যুবক গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রণামের পর বলিলেন, আমি দীক্ষা নিতে এসেছি। শ্রীমহাপুরুষ প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। যুবক পুনরায় ঐ কথা আবৃত্তি করিলে তিনি বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন, সে কি? তুমি দীক্ষা নাও নাই — অতদিনের পুরোনো ভক্ত? (একটু পর) আচ্ছা হয়ে যাবে।

সাড়ে সাতটায় সাধু ভক্তগণ দল করিয়া গৌরীকুণ্ডে স্নান করিতে গেলেন — স্বামী সিদ্ধানন্দ, চীনু, মণীন্দ্র, জগবন্ধু, তাম্বি ও ডাক্তার। তারপর গেলেন লিঙ্গরাজ মন্দিরে। ইঁহারা মন্দিরে গিয়া দেখিলেন শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে। স্বামী শর্বানন্দ, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, স্বামী যতীশ্বরানন্দ ও স্বামী নির্বাণানন্দও সঙ্গে আসিয়াছেন। দর্শনের পর নাটমন্দিরের সংস্কার সকলে দর্শন করিতেছেন। বহু বৎসর পর সরকার মন্দির সংস্কার করিতেছেন! ভুবনেশ্বর মন্দির একাদশ শতকের কারুকার্যে অতুলনীয় ও ভারতবিখ্যাত। গুজরাট হইতে শ্রেষ্ঠ ভাস্কর আনিয়া ভগ্ন মূর্তিসমূহের সংস্কার করা হইতেছে। ইন্‌জিনিয়ার বুঝাইয়া দিতেছেন। যাত্রীদের নিকট হইতে এই সংস্কারকার্যের জন্য জনপ্রতি দুই পয়সা করিয়া লওয়া হইতেছে।

মহাপুরুষ এই মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছেন। পাণ্ডারা হাঁক দিতেছে, ইয়ারে আস, দর্শন কর। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, হাঁ-হাঁ। (সাধুদের প্রতি) দাও, একটা একটা পয়সা দিয়ে দাও ওদের, তা হলেই হলো।

মহাপুরুষ মন্দিরের বাহিরে আসিয়া রিক্সাতে উঠিলেন। রিক্সা

বিন্দুসরোবরের পূর্ব পাড় দিয়া মঠে আসিল।

৩

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

এখন সাড়ে নয়টা। দীক্ষার্থীগণ দোতলায় ঠাকুরঘরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। দশটার সময় শ্রীমহাপুরুষ উপরে আসিয়া ঠাকুরঘরে বসিলেন। প্রথমে একটি ভক্ত মহিলার দীক্ষা হইল। তারপর ডাক পড়িল একটি যুবকের। ভাস্বরেশ্বরানন্দ পূজারী। ইনি আসিয়া যুবককে ঠাকুরঘরে যাইতে বলিলেন। যুবক ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিতেই শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, ঠাকুরকে প্রণাম করে বসো। যুবক বসিলেন, দক্ষিণাস্য, শ্রীমহাপুরুষ বসিয়াছেন পূজারীর আসনে, উত্তরাস্য। গৃহে এক স্বচ্ছ প্রশান্ত গম্ভীর ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। অবতারের অন্তরঙ্গ পার্ষদের আন্তরিক আহ্বানে আজ বুঝি ঠাকুর আসিয়াছেন। সিদ্ধ আচার্য হইয়াও যেন দাসবৎ ঠাকুরের নাম বিতরণ কার্যে ব্রতী। অহংকারের লেশ নাই। অতি মৃদুভাবে যুবককে বলিলেন, তোমাকে কি বলবো — তোমরা সবই জান। মাস্টার মশায়ের এমন দুর্লভ সঙ্গ আর কৃপা পেয়েছ। তোমাদের বলবার আর কিছু নেই। তোমার তো শরীর মন তাঁকেই সমর্পণ করেছ। তবে তুমি তাঁর নাম চাইছো তাই তোমাকে বলে দিচ্ছ।...এই তোমার ইষ্টমন্ত্র। আর সব যেমন করছো তাই করবে। তবে সকাল আর সন্ধ্যায় দুবার বসতে হবে।

সংখ্যা জপের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, তোমার যা ইচ্ছা — দুই পাঁচ সাত মিনিট — যা ইচ্ছা, বসবে ও জপ করবে। সময় ক্রমে বাড়িয়ে দিতে পার।

এখন দশটা তের মিনিট দেখিয়া বলিলেন, আচ্ছা, বাইরে বারান্দায় বসে জপ কর। আর লক্ষ্মণকে ডেকে দিও।

পূর্বের মহিলা ও লক্ষ্মণকে দিয়া অনেক পূজা, অঞ্জলি, অর্ঘাদি দেওয়াইলেন। যুবককে কেবল ঐ নাম ও উপরের বাণীমাত্র বলিলেন। আহার করিতে সাড়ে বারটা বাজিয়া গেল — শ্রীমহাপুরুষের প্রসাদও গ্রহণ করা হইল।

অপরাহ্ণ চারিটার সময় ফটকের বাহিরে বনে বটতলায় বসিয়া ধ্যান করিতেছেন যুবক। সন্ধ্যায় সাধু ও ভক্তসঙ্গে ভ্রমণান্তর সকলে আরতি

দর্শন করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া জপধ্যান করিতেছেন। যুবক শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের সাড়া পাইয়া নিচে নামিয়া আসিলেন। এখন সন্ধ্যা সাতটা।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ হলঘরের সম্মুখে বারান্দায় ইজি-চেয়ারে উপবিষ্ট, দক্ষিণাস্য। একটি ভক্ত যুবক আসিয়াছেন, দীক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন। যুবকের বয়স ত্রিশ হইবে। বারান্দায় পশ্চিম প্রান্তে স্বামী শর্বানন্দ, বরদানন্দ প্রভৃতি অন্ধকারে মেঝেতে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন। বনের মধ্যে মঠটি — চারদিকে গভীর নীরবতা। এই নীরবতা ভেদ করিয়া মহাপুরুষের বাণী দৈববাণীর মত সকলের কর্ণে প্রবেশ করিল।

শ্রীমহাপুরুষ — (দীক্ষাপ্রার্থীর প্রতি) বাবা, গায়ত্রী জপ করতে পার না, আবার দীক্ষা নিয়ে কি হবে? দীক্ষা নিলে যে bound up (নিয়মবদ্ধ) হয়ে যাবে। গায়ত্রী দীক্ষা তো পেয়েছ। কিন্তু তা পালন করতে পারছ না। আবার দীক্ষা নিয়ে কাজ না করা, সে আরও খারাপ। করছি না — এমনি তা বরং ভাল। তবুও নিয়ে না করা আরও খারাপ, আরও খারাপ।

দীক্ষার্থী — নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে হয়ে ওঠে না।

শ্রীমহাপুরুষ — কই, তোমার শৌচাদি বন্ধ তো হয়না তা'তে? যত না করা তাঁর বেলায়। খাওয়াদাওয়া, শৌচ, নিদ্রা —এগুলি তো বন্ধ হয় না। শৌচ পেলে কি বন্ধ করে রাখতে পারে? তেমনি ঈশ্বরে ডাকা। শৌচাদি যেমন অপরিহার্য — তেমনি তাঁকে ডাকা।

আরে বাবা, যাঁর ব্রহ্মাণ্ডে বাস, যিনি সকলের পিতা মাতা ভ্রাতা স্বজন সুহৃদ — সমস্ত, তাঁকে একটু ডাকবে না মানুষ, তো কি করবে! আমি তুমি সব চলে যাবে। তিনি থাকবেন — তাঁকে ডাকবে না!

"গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥" (গীতা (৯-১৮)

চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচ মিনিট দিলে হয়। চব্বিশ ঘন্টায় এ সময় হয় না? তবে আর মানুষে আর পশুতে তফাৎ কি? আহার বিহার শয়ন ইত্যাদিতে উভয়েরই সমান।

"আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুর্ভিনরাণাং
ধর্ম হি তেষামধিকো বিশেষো

ধর্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানা।।”

(আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনে মানুষ আর পশুতে ব্যবহার সমান। মানুষের বিশেষত্ব ধর্মাচরণ। ধর্মাচরণ ছাড়িয়া দিলে মানুষও পশুর সমান।)

তফাৎ এইটুকুতে — মানুষ তাঁকে ডাকতে পারে, পশুরা তা পারে না। দেখেছ তো, তাঁকে না ডেকে মানুষ কিরূপ মোহে পড়ে? এদিক দিয়ে প্রাণ বেরুচেছ তবুও বলছে, আন কালি কলম। লিখছে, অমুক — অত কোম্পানীর কাগজ। অমুক — এত টাকা, ইত্যাদি। তাঁর মহামায়াতে আমরা সবাই রয়েছি। যার যা কাজ তা কর না — কাজ করবে না তো কি করবে? কিন্তু তাঁকে ভুলো না।

বাপ মরে যাচেছ ছেলেরা কাঁদছে। আবার খাচেছও। ও-টি বন্ধ হতে পারে না। তেমনি তাঁকে ডাকা। তাঁ’তে ভালবাসা না হলে কিছুই কিছু নয়। তাঁকে ভালবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য। দীক্ষা ফীক্কা কিছুই কিছু নয় ও-টি না হলে।

এ সংসারেরই নাম প্রবৃত্তি। নিবৃত্তিই তিনি। আর duty (কর্তব্য) হিসাবে যদি ধর, তা হলে তাঁকে ডাকা one of the chief duties (প্রধান কর্তব্যের মধ্যে একটি)।

দেখছো না, এসব কাজ না করে ব্রাহ্মণ কি হয়ে গেছে! কি দুর্ভাগ্য, বাড়িতে নারায়ণ আছেন — তাঁর পূজো করাচেছ মাইনে করা বামুন দ্বারা। আরে কি দুর্ভাগ্য! কোথায় নিজের করবার কথা — তা না, মাইনে-করা লোকদ্বারা করানো হচেছ। এতেই তো এইরকম দুর্দশা।

আর জীবের ওপর, fellow being-দের ওপর একটু দয়া করা। অনেকে বলে টাকা নেই। আরে, শুধু টাকাতে কি দয়া হয়? তোমার মনে যদি থাকে দয়া, তা হলেই হলো। তোমার (টাকা) নেই, অন্যের কাছ থেকে চেয়ে যদি দাও — মশায়, এঁর বড় কষ্ট হচেছ বলে — তা হলেও হয়। তেমন হৃদয়ে তাঁর কৃপা শীঘ্র হয়। এই কথাগুলি রাত্রে গিয়ে বিবেচনা করে দেখ। এখনও অনেক সময় আছে।

শ্রীমহাপুরুষ একটু মৌন রহিলেন। আবার কথা কহিতেছেন। কিন্তু এবারের কথায় বিচার নাই — কেবল দয়া, কৃপা, করুণা। কণ্ঠস্বর বদলাইয়া গেল। অতি করুণামধুর স্বরে বলিলেন — আরে, দীক্ষা তাঁর (ঠাকুরের)

নাম, শুনিয়ে দেব না কেন, বাবা — ভগবানের নাম শুনিয়ে দেব না, কেন বাবা?

এই কথা শুনিয়া একজন ভাবিতেছেন, কি সুদৃঢ় বিশ্বাস এই মহাপুরুষের! বলছেন, ঠাকুরই ভগবান। প্রত্যক্ষ অনুভূতিপ্রসূত এই বিশ্বাস। ঠাকুরের কৃপায়ই কেবল আমাদের এই বিশ্বাস লাভ হতে পারে।

পরের দিন, ৭ই মে, শুক্রবার। আজ সকালে স্বামী সিদ্ধানন্দ, জগবন্ধু, ডাক্তার প্রভৃতি সকলে বিখ্যাত গুহা উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি দর্শন করিতে গেলেন। ভারতবিখ্যাত এইসব গুহা হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন সাধুদের তপস্যার স্থান। ফিরিতে দেরী হয় নাই, তবুও শোনা গেল, শ্রীমহাপুরুষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। হয়তো বা তাঁহার অনুমতি না নিয়া যাওয়ায় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

আজ শ্রীমহাপুরুষ মাদ্রাজ রওনা হইবেন। তাই আহারাদি শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া সকলে বিশ্রাম করিতেছেন। বেলা প্রায় দেড়টা। শ্রীমহাপুরুষ হলঘরে চেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। কাছে সেবক অপূর্বানন্দ, সিদ্ধানন্দ, মণীন্দ্র, তাম্বি প্রভৃতি। পুরীবাসী একটি যুবক শ্রীমহাপুরুষকে একটি টাকা দিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, তুমি টাকা দিচছ, কোথায় পাবে? বিদেশে রয়েছ। যুবক সঙ্কুচিত হইয়া করজোড়ে উত্তর করিলেন, চলবে। শ্রীমহাপুরুষ আবার বলিলেন, কি করে চলবে বিদেশে? যুবক মৌন হইয়া রহিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক ইচছা দেখিয়া টাকাটি গ্রহণ করিলেন। সেবককে বলিলেন, নাও রেখে দাও। যুবক অকিঞ্চন ব্রহ্মচারী।

ভুবনেশ্বর হইতে আড়াইটার গাড়ীতে শ্রীমহাপুরুষ ও পার্টি মাদ্রাজে রওনা হইলেন। পুরীর পার্টিও ঐ সঙ্গে উঠিলেন। খুর্দাতে গাড়ী ধরিবেন। শ্রীমহাপুরুষকে সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমে প্রণাম করিয়া পুরীর পার্টি ট্রেনে উঠিলেন।

ট্রেনে বসিয়া সাধু ও ব্রহ্মচারীগণ এই তিনদিনের আনন্দ উৎসবের কথা ভাবিতেছেন। কি আশ্চর্য পুরুষ ব্রহ্মদ্রষ্টাগণ, আবার ভগবানের পার্ষদ যাঁরা! শ্রীমহাপুরুষকে ঘিরিয়া যেন একটা অভয় ও আনন্দভাব বিরাজমান। কোন কথা না বলিলেও যে স্থানে উনি থাকেন সেই স্থান

সুখ শান্তি আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে। মঠ যেন আনন্দসাগরে ভাসিতেছিল। তাই শাস্ত্র বলেন, মহাপুরুষ সংসারে দুর্লভ। আমরা ভাগ্যবান নিশ্চয়! অবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান মহাপুরুষ মহারাজ প্রভৃতি সকলে স্নেহ করেন, আমাদিগকে ভালবাসেন — অকিঞ্চন জানিয়াও। ইহাই অহেতুক কৃপা।

পুরী ও ভুবনেশ্বর-প্রসঙ্গ পাঠ শেষ হইল। শ্রীম বলিলেন, এই আমাদের পুরী ও ভুবনেশ্বর দর্শন হয়ে গেল। এসব অমূল্য বিবরণ। শুনলে জোর করে মনকে ঈশ্বরে নিয়ে যায়। সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা-বই মানুষের উপায় নাই।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — আরও কিছু বিবরণ আছে কি পুরোনো ডায়েরীতে।

অন্তেবাসী — আজ্ঞে, হাঁ। মঠের, মহাপুরুষ মহারাজের আরও কিছু কথা আছে।

শ্রীম — বেশ তা-ও শোনাও পড়ে। এসব অমৃত! যতই শোনা যায় ততই ভাল। যে শোনায়, আর যে শোনে, উভয়ের মঙ্গল হয় এতে। মন ঈশ্বরে নিয়ে যায়। মহাপুরুষ তাই বলেছেন শাস্ত্র অপরকে শোনাতে। উভয়ের কল্যাণ।

৪

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

২৪শে মার্চ, ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ, ১০ই চৈত্র, ১৩৩৩ সাল, বৃহস্পতিবার। বেলুড় মঠ। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের গৃহ। সময় সকাল সাতটা। মহাপুরুষ মহারাজ কি লিখিতেছিলেন। একটি যুবক গৃহে প্রবেশ করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। তিনি মহাপুরুষ মহারাজকে বলিলেন — মহারাজ, আপনি যখন কৃপা করে নাম ও গেরুয়া বস্ত্র দেবেন, ঐ সঙ্গে ব্রহ্মচর্য সংস্কারটা হলে বেশ হয়, মন শান্ত হয়। তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন — হাঁ, হবে। ডাক তো অনঙ্গকে (স্বামী ওঁকারানন্দকে)। (উনি আসিলে) দেখ, কাল এর ব্রহ্মচর্য হবে। সব যোগাড় কর। অনঙ্গ উত্তর করিলেন, আমায় নোয়াখালি যেতে হবে। শশধরকে (স্বামী মুকুন্দানন্দকে) বলে

যাব। পূজ্যপাদ শ্রীমও একদিন যুবকের নিকট ব্রহ্মচর্য সংস্কারের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন।

অপরাহ্ন ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ মঠের সম্মুখের লনে পায়চারি করিতেছেন। একটু পর লনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের বুরুজে গিয়া বসিলেন। নিম্নে গঙ্গা। একজন ব্রহ্মচারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীমহাপুরুষ ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, পোস্তাটা তেতেছে খুব। এই কথার অভিপ্রায় বুঝিয়া ব্রহ্মচারী দুইটি বালতি লইয়া আসিলেন। আর গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া পোস্তার উপর ঢালিতে লাগিলেন। স্বামী ওঁকারানন্দ দূর হইতে ইহা দেখিলেন। তিনিও আসিয়া জল তুলিতে লাগিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ উপস্থিত সাধুদিগকে বলিলেন — স্বামীজী বলেছিলেন, এখানে লেখাপড়ার খুব চর্চা থাকবে। যেমন শাস্ত্রজ্ঞান দরকার, তেমনি জগতের নানা বিদ্যার জ্ঞানও থাকবে। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান — এসবও জানা চাই। স্বামী ওঁকারানন্দ উত্তর করিলেন — হাঁ মহারাজ, এখান থেকে প্রচারক পাশ্চাত্ত্যেও যাবে। ও সবেরই দরকার।

একটু পর শ্রীমহাপুরুষ উঠিয়া পূর্ব বারান্দায় বেঞ্চিতে গিয়া বসিলেন গদির উপর। গঙ্গা দর্শন করিতেছেন। সাধুরা কেহ কেহ আশেপাশে দাঁড়াইয়া আছেন। নানা কথা হইতেছে। স্বামী ওঁকারানন্দ কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, গোপাল (স্বামী গোপালানন্দ) ময়মনসিং-এ আছে, আশ্রমে। মঠে আসতে চায়। শ্রীমহাপুরুষ উত্তর করিলেন, ও বাইরে থাকতে পারে না। মঠের উপর খুব টান। বাবুরাম মহারাজের স্মৃতি রয়েছে কিনা এখানে। খুব ভক্ত লোক।

এখন সন্ধ্যা। ঠাকুরের আরতি হইয়া গিয়াছে। সাধুরা অনেকেই ঠাকুর-ঘরে ও অন্যত্র জপধ্যান করিতেছেন। স্বামী বিরজানন্দ একজন যুবককে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মকে দিয়া ডাকাইয়া আনিলেন, দ্বিতলে তাঁহার ঘরে। ইনি যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, উনি (মহাপুরুষ) কি বলেছিলেন? ব্রহ্মচর্যের কথা উনি বলেন নাই। তুমি বলেছিলে? যুবক উত্তর করিলেন — না, গোড়ায় উনিই বলেছিলেন। আজ আমিও বলেছিলাম। স্বামী বিরজানন্দ সেক্রেটারী।

একটু পর স্বামী শুদ্ধানন্দ ও যুবককে লইয়া তাঁহার ঘরে (মহারাজের ঘরে) প্রবেশ করিলেন। কথাবার্তা হইতেছে। উনি যুবককে বলিলেন, আচছা গেরুয়ার কি দরকার আছে? তুমি বরং মাদ্রাজে যাও। যদি দরকার হয় আমি তোমায় যাতায়াতের ভাড়া দেব। এসে নিয়ে যাবে।

ইহার পর স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী শুদ্ধানন্দ শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা কহিলেন, যাহাতে ঐ যুবকের ব্রহ্মচর্য সংস্কার না হয়। যুবক মঠে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করিয়াছেন ছয় মাস পূর্বে। তদবধি স্বামীজীর মন্দিরের সেবা করিতেছেন। বহুকাল হইতে মঠে যাতায়াত করেন যুবক, সকলের সুপরিচিত।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ স্বামীদ্বয়কে বলিলেন — না, হয়ে যাক্ ব্রহ্মচর্য। আম বহুদিন থেকে জানি। খুব ভাল ছেলে, আর পবিত্র। লেখাপড়া জানে, 'ল' পড়েছে। বহুদিন মাস্টার মশায়ের কাছে রয়েছে। স্বামীজীরা উত্তর করিলেন, তিন বছর থাকার পর ব্রহ্মচর্য হওয়ার নিয়ম আছে। ওটা ভঙ্গ হয়। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন — দেখ, নিয়ম কিছু নয়। মানুষকে দেখতে হয়। তিন বছর বলছো, তা আমি অনেক বছর থেকে তাকে জানি। খুব সৎ ও পবিত্র, আর বুদ্ধিমান ছেলে। নানা কথার আদান প্রদানেও শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নিজের মত অপ্রতিহত রহিল। তিনি যুবককে আগামী কল্য গেরুয়া ও ব্রহ্মচর্য দিবেন।

রাত্রির আহার শেষ হইয়া গিয়াছে। সাধু ব্রহ্মচারীগণ নিজ নিজ থালা গঙ্গায় ধুইয়া আসিতেছেন। একটি যুবকও থালা ধুইয়া ফিরিতেছেন। তিনি গঙ্গা হইতে আসিয়া মঠের পূর্ব বারান্দায় উঠিয়াছেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী বিরজানন্দ বারান্দায় হেলান বঞ্চিতে বসিয়া আছেন। তাহারা যুবককে বলিলেন, তুমি থালাটা রেখে একবার এদিকে এসো। যুবক আসিলে, স্বামী শুদ্ধানন্দ যুবককে তাঁহার পাশে বেঞ্চিতে বসাইয়া বলিলেন — দেখ, তুমি educated, intelligent (শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান) ভক্ত লোক। এতদিন ধরে আসা-যাওয়া করছো। মঠের সব ব্যাপার তো জান। তোমরা যদি মঠের নিয়ম না মান তবে সব farce (তামাসা) হয়ে দাঁড়ায়। Institution-এর (সঙ্ঘের) rules-এর (নিয়মের) দিকেও দেখতে হয়। তুমি sacrifice (স্বার্থত্যাগ) কর। তোমাকে তো বলেছি, আমি

promise (প্রতিজ্ঞা) করছি, তোমার আসা-যাওয়ার খরচ দেব, যদি গেরুয়া নেওয়ার দরকার থাকে, মাদ্রাজে কাজ করতে হলে। sacrifice (নিজের স্বার্থ ত্যাগ) কর সঙ্ঘের জন্য। যুবক উত্তর করিলেন, আমার পক্ষে মহাপুরুষ মহারাজকে কিছু বলা বড়ই difficult question (কঠিন ব্যাপার)। আমি তো গোড়ায় চাই নি কিছুই। উনিই কয়েক মাস ধরে বলছেন প্রত্যহ, 'Get ready for gerua' (গেরুয়া নেবার জন্য প্রস্তুত হও)। উনি যদি কৃপা করে নিজে যেচে কিছু দিতে চান আমার ধর্মজীবনের কল্যাণের জন্য, তা হলে আমার পক্ষে তা প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। আপনারা তাঁকে বলে ক’য়ে তাঁর মত পরিবর্তন করাতে পারেন তাতে আমার আপত্তি নাই।

মহাপুরুষ মহারাজের তিনমাস ধরিয়া যুবককে গেরুয়া নিবার জন্য প্রত্যহ বলার আর একটা কারণও আছে বলিয়া মনে হয়। উহা তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্মজীবনের উন্নতি। এই যুবক দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রীম-র মুখে বহুবার শুনিয়া আসিতেছেন — গেরুয়া নিবার অধিকার হয় যখন কেহ চব্বিশ ঘন্টা ভগবানের চিন্তা করিতে সমর্থ হয়। যুবক বিচার করিয়া দেখিলেন, তিনি চব্বিশ ঘন্টা ঈশ্বরচিন্তা করিতে সমর্থ নহেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, সাধুজীবন যাপন করিব। যদি ঈশ্বরের কৃপায় এমন সময় আসে যখন চব্বিশ ঘণ্টা ঈশ্বরচিন্তা করিতে সমর্থ হই, তখন গেরুয়া নিব। তাহার পূর্বে সাদা কাপড়েই সাধু হইয়া থাকিব। যুবক সরলভাবে বিশ্বাস করিতেন, মঠের গেরুয়াধারী সকল সাধুই চব্বিশ ঘন্টা ঈশ্বরচিন্তা করিতে সমর্থ। এই জন্য মঠের সাধুদের উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তিশ্রদ্ধা জাগরূক ছিল। শ্রীম-র দৃষ্টিতে তিনি তাঁহাদিগকে দৈবী মানুষ মনে করিতেন।

শ্রীমহাপুরুষ ইদানীং নিত্য গেরুয়া নিবার কথা বলায় তাঁহার মনে এক সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীম মায়ের মত স্নেহে শিক্ষা দিয়াছেন — চব্বিশ ঘন্টা ঈশ্বরচিন্তা করিতে পারিলে গেরুয়া নিবার অধিকার। শ্রীমহাপুরুষ এখন গুরুরূপে বলিতেছেন, গেরুয়া নিবার জন্য প্রস্তুত হও। নিজের মনের ভিতর চাহিয়া দেখিলেন, চব্বিশ ঘন্টা ঈশ্বরচিন্তা করিতে তিনি অসমর্থ। এই দুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবের ঘাতপ্রতিঘাতে বিব্রত হইয়া যুবক একদিন মাতৃপ্রাণ শ্রীম-র নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা

বলিলেন। শ্রীম জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন, মহাপুরুষ তিনমাস ধরিয়া নিত্য গেরুয়া নিবার কথা বলিতেছেন। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বল মহাপুরুষ মহারাজকে, উনি যখন গেরুয়া নিতে বলেন? যুবক বলিলেন, কিছুই বলি না, চুপ করে থাকি। শ্রীম তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, মহাপুরুষ গেরুয়া দিতে চান, আর তুমি চুপ করে থাক। এতো বুদ্ধি তোমার! আমায় যদি এরূপভাবে গেরুয়া নিতে বলেন, তবে আমি ধেই ধেই করে নাচি গেরুয়া মাথায় নিয়ে। একি আর মহাপুরুষ দিচ্ছেন, ঠাকুর স্বয়ং দিচ্ছেন! ঠাকুরের link (সংযোগ-যন্ত্র) এঁরা।

অভিমান আহত হওয়ায় শ্রীম-র স্নেহতিরস্কারে, যুবক বলিলেন, মহাপুরুষ মহারাজের অযাচিত কৃপাপ্রকাশে চুপ করে ছিলাম সে তো আপনারই শিক্ষায়। আপনি বরাবর বলেছেন, চব্বিশ ঘন্টা ঈশ্বরচিন্তা করতে পারলে গরুয়া নেবার অধিকার হয়। যুবকের সস্নেহ অভিমানের ফলস্বরূপ শ্রীম-র মুখে প্রস্ফুটিত হইল একটি সরল সরস দৈবী হাসি। বলিলেন — হাঁ, তখন বলেছি ঐ কথা — এখন বলছি এই কথা। গেরুয়া নেও। যাও, এক্ষুনি মঠে চলে যাও। মহাপুরুষ কাল সকালে যখন গেরুয়া নেবার কথা তুলবেন, তখন করজোড়ে বলবে — মহারাজ, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন।

রাত্রি অধিক বলিয়া যুবক মঠে গেলেন না। শ্রীম-র কাছেই রহিলেন মর্টন স্কুলে। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া মঠে গেলেন। আর শ্রীম-র শিক্ষা অনুসারে মহাপুরুষ মহারাজকে বলিলেন — যখন তিনি গেরুয়া নিবার প্রস্তাব করিলেন পরের দিন — মহারাজ, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন। মহাপুরুষ মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন — হাঁ বাবা, তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে। তোমায় গেরুয়া দেব।

দুইজন দিব্য মানবের, দুইজন গুরুর দুইটি আপাতঃবিরুদ্ধভাবে যখন যুবকের মন বিব্রত, তখন যুবক একজন সুপণ্ডিত বৈরাগ্যবান প্রাচীন সাধুর সঙ্গে সকল কথার আলোচনা করিলেন। সাধু বলিলেন, দুইজনেই একই কথা ভাবিয়াছেন। শ্রীম একটি উচ্চ আদর্শ সম্মুখে ধরিলেন যাহাতে ধর্মজীবন সুপ্রতিষ্ঠ হয়, যাহাতে ভগবানদর্শন জীবনের উদ্দেশ্য — এটা

সর্বদা মনের সম্মুখে জাগ্রত থাকে। আর মহাপুরুষও আপনার ধর্মজীবনের উন্নতির কথাই ভাবিয়াছেন। মধ্যপথেই জীবন আরম্ভ হয়। আপনার সন্ন্যাস না নেওয়ার সঙ্কল্প তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অধিকার ও অনধিকার — এই চিন্তা-প্রবাহের মধ্যস্থলেই ধর্মজীবন। দীর্ঘকাল একটি ভাব ধরিয়া থাকিলে উর্দ্ধগতি ব্যাহত হয়। তাই মহাপুরুষ এই কথা বুঝিয়া ধীরে ধীরে গেরুয়া না লইবার সঙ্কল্প ছিন্ন করিয়া দিলেন। তাই শ্রীমও এখন আনন্দে মত দিলেন গেরুয়া লইবার। দুইজনেরই একই ভাব — ভক্তের উপর অহেতুক কৃপা। শ্রীমহাপুরুষের কৃপায় আগামী কল্য যুবকের ব্রহ্মচর্য ও গেরুয়া ধারণ হইবে।

এখন রাত্রি দশটা। শ্রীমহাপুরুষ নিজের ঘরে বসিয়া আহার করিতেছেন। সেবক ক্ষিতীন্দ্র সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। দক্ষিণ দরজার পাশে দাঁড়াইয়া স্বামী শঙ্করানন্দ মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

একটি যুবক দরজার বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। প্রায় পনের মিনিট পর শ্রীমহাপুরুষের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল। তিনি আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, ready for gerua, ready for Madras! (গেরুয়া নেবার জন্য প্রস্তুত হও, মাদ্রাজ যাবার জন্য প্রস্তুত হও)। যুবক উত্তর করিলেন — আজ্ঞে হাঁ, সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সব হবে, কৃপা করে গেরুয়া দিবেন, নাম দিবেন, অথচ হোম সংস্কারটা হবে না বলে মনে কি রকম একটা খটকা লাগছে।

শ্রীমহাপুরুষ — দেখ, খটকা এনো না। আমাদের উপর ভার দিয়েছ, তোমার খটকা কি? তোমার খটকা কেন আবার? আমি সব করিয়ে দেব অন্যভাবে। আমি যাব নিজে তোমায় নিয়ে ঠাকুরঘরে! ঠাকুরের পাদপদ্মে মন্ত্র বলে এক একটি করে অর্ঘপ্রদান আমি নিজে করাবো। আমি সব করিয়ে দেব। ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে তোমাকে উৎসর্গ করে দেব।

যুবক — মনে হচেছ, দশজনের যেমন হয় সব হোম আদি করে, আমার তেমন হলো না, এই বলে খটকা।

শ্রীমহাপুরুষ — দেখ, form-টার (বাহ্য আকারটার) উপর লক্ষ্য রেখো না। Spirit-এর (অন্তরের ভাবটির) উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। (বুকে হাত দিয়া) এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে — spirit-এ (অন্তরের ভাবটিতে)।

Spirit (ভাব) না থাকলে শুধু form (বাহ্য আচরণে) কি হয়?

স্বামী শংকরানন্দ — তুমি কেন অত ভাবছো? তিনি যখন নিজে তোমার ভার নিলেন তখন তোমার কেন অত সব ভাবনা? ছেড়ে দাও ওঁর ওপর।

যুবক তবুও দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, রাত্রি এগারটা হয়ে গেছে। এখন যাও শোওগে। কাল সব হয়ে যাবে। ঠাকুরের শ্রীচরণে তোমায় উৎসর্গ করে দেব আমি নিজে। তাঁর চরণই সার। তিনিই জীবের ও জগতের অন্তরাত্মা। তিনিই পরমব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা। তিনিই অন্তর্যামী। তিনিই ইদানীং নরকলেবরে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। তিনি আমাদের তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়েছেন। সেই শ্রীচরণে কাল তোমায় সমর্পণ করে দেব। আনন্দ কর। যাও, এখন গিয়ে আনন্দে শুয়ে পড়। জয় প্রভু!

স্বামীজী যখন মঠের নিয়ম গঠন করেন তখন বলিয়াছিলেন, আমরা এইসব নিয়মের ঊর্ধ্বে উঠবো। Spirit-ই (ভাবই) আসল। এটাই সত্যিকার জিনিস। এরই জমাটবাঁধা মূর্তি ঠাকুর।

শ্রীম — আহা! কি কথা! দেবদৃশ্য! অমূল্য বিবরণ! সংসার যাচেছ ভোগপ্রবাহে। আর এঁরা যাচেছন তার বিপরীত দিকে, ঈশ্বরের দিকে। এটি না থাকলে সংসার পশুশালায় পরিণত হতো। ঈশ্বর ও জগৎ, God and mammon, এই দুইটি বিপরীত দিকে চলছে। সাধুরা যাচেছন ঈশ্বরের দিকে। অন্যরা অন্য দিকে, সংসারভোগে। আরও আছে?

অন্তেবাসী — আজ্ঞে হাঁ। এরই অপরাংশ।

শ্রীম — শোনাও। ভক্তরা শুনলে চৈতন্য হয়ে যাবে।

৫

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

২৫শে মার্চ ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ। ১১ই চৈত্র ১৩৩৪ সাল, শুক্রবার। বেলুড় মঠ। বসন্ত কাল। সকাল সাড়ে আটটা। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কক্ষ। তিনি পালঙ্কের উপর বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। এক একবার ঠাকুরঘরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। সশ্রদ্ধ আনন্দময় ভাব। প্রসন্ন

মুখমণ্ডল। একটি যুবক আসিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। শ্রীমহাপুরুষ কুশল জিজ্ঞাসার পর তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন। যুবক ব্রহ্মচারী। মঠের কাজে তিনি আজ মাদ্রাজ যাইবেন।

শ্রীমহাপুরুষ — (ব্রহ্মচারীর প্রতি) আমি নিজে সব করিয়ে দেব, কি ভাবনা! তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে — কোনরকম নড়বে না। মাস্টার মশায়ের ওখানে ছিলে। দেখেছ তো — কেমন ঠাকুরগত প্রাণ তিনি! ঠাকুর ছাড়া কিছুই জানেন না। ঠাকুরের অনেকগুলি ভাব আছে ওখানে। ওখানে থেকে কতকগুলি ভাব পেয়েছ। তা আমি দেখতে পাচিছ। তাই স্থির ভাব আছে তোমার — নড়বে না।

পুরী থেকে যখন তুমি আমায় মাদ্রাজে লিখেছিলে, তখনই আমি রামুকে বলে রেখেছি তোমার কথা। (রামু ঠাকুরের প্রধান সেবক, কর্মী রামুস্বামী আয়ঙ্গার)। রামু এখন আর তেমন কর্ম করতে পারে না, বয়স হয়েছে। তার কাজটা তুমি দেখবে স্টুডেন্টস্ হোমে। আর তখনই (বেলুড় মঠে) ওদেরও লিখেছিলাম, ও মঠে আসবে! ওকে আমার মাদ্রাজের কাজের জন্য রেখে দিও।

দেখ, কত ভাগ্যে মাস্টার মশায়ের সঙ্গে এতদিন ছিলে! আরও কত তাঁর কৃপা যে এখানে আসতে পেয়েছো! আরও কত ভাগ্য, তাঁর কাজে লাগতে পেরেছ!

মাস্টারমশায় (শ্রীম) ব্রহ্মচারীকে মঙ্গলময় উচচ ভাবে আরোহণ করাইবার জন্য সুগভীর উপদেশ দিয়াছিলেন, অনেকদিন হইতে অনেকবার — গৈরিক, সন্ন্যাস গ্রহণ করা যায় যখন চব্বিশ ঘন্টা ঈশ্বরের চিন্তা করা যায়। ব্রহ্মচারী নিজের ভিতর এই উচচ ভাবের অভাব দেখিয়া সংকল্প করিয়াছেন, সাধুজীবনই যাপন করিবেন, কিন্তু শুভ্রবস্ত্রে। অথচ কিছুকাল ধরিয়া শ্রীমহাপুরুষ তাঁহাকে গৈরিকবস্ত্র ধারণ করিতে উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু, ব্রহ্মচারী শুভ্রবস্ত্রেই থাকিতে চান। এই সম্বন্ধে কথাবার্তা চলিতেছে।

শ্রীমহাপুরুষ (ব্রহ্মচারীর প্রতি) — তাহলে কিছুদিন সাদা কাপড়ে থাকবে? ওখানেও (মাদ্রাজ মঠেও) আছে গণেশচৈতন্য।

মহাপুরুষের গৈরিক দিবার অত আগ্রহের কথা জানিতে পারিয়া শ্রীম ব্রহ্মচারীর পরম কল্যাণসাধনের জন্য নূতন করিয়া উপদেশ দিয়াছেন,

শ্রীমহাপুরুষের হস্তে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দিতে, সম্পূর্ণ শরণাগত হইতে। ইহাতে পরম মঙ্গল হইবে। তাই ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন নিম্নরূপ।

ব্রহ্মচারী (শ্রীমহাপুরুষের প্রতি) — আজ্ঞে, আপনার যা খুশি তাই করুন। আমার আর কিছু বলবার নাই।

শ্রীমহাপুরুষ (প্রসন্নভাবে) — হাঁ, তাই ঠিক। শরণাগত, তাঁর পাদপদ্মে শরণাগত — complete resignation.

বাবা, বিবেকবৈরাগ্য কি বস্তু, তা কি আমরা জানতাম? তাঁকে (ঠাকুরকে) দেখে আমরা একটু বুঝেছি — জ্ঞান ভক্তি বিবেকবৈরাগ্য ভালবাসা প্রেম — এই সব কি বস্তু! তিনি না এলে কোথায় দেখতে পেতাম এসব!

বাইরে যাও না। দেখবে, এক পয়সার গেরুয়া কিনে কাপড় রং করে নিজেই নাম নিলে সহজানন্দ কি, এমনি একটা কিছু। আমরা criticise (সমালোচনা) করছি না। তবে চোখের সামনে যা দেখছি তাই বলছি। খাঁটি জিনিসটি, তাঁকে দেখেছিলাম বলে, একটু যা বোঝা গেছে! তোমার গেরুয়া পরা চাই-ই! কাপড়ে রং দিয়েছ?

ব্রহ্মচারী — আজ্ঞে না।

শ্রীমহাপুরুষ — আচছা, হয়ে যাবে। এখান থেকেই দেওয়া যাবে।

এখন দশটা। ঠাকুরের নিত্যপূজা শেষ হইয়াছে। শ্রীমহাপুরুষ ঠাকুর-ভাঁড়ারি গঙ্গাধরকে বলিলেন, একটি পুষ্পপাত্রে সব সাজিয়ে— বিল্পপত্র, পুষ্প, দুর্বাদল, চন্দন, তণ্ডুলাদি ঠাকুরঘরে রেখে দাও।

শ্রীমহাপুরুষ শুদ্ধবস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিয়া ব্রহ্মচারীকে লইয়া দ্বিতলে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি নিজে ঘরের সকল দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন, আর পূজারীর আসনে বসিলেন উত্তরাস্য দক্ষিণের মধ্য দরজার পশ্চিম পার্শ্বে। তাঁহার সম্মুখে ঠাকুরের শ্রীপাদুকা কাষ্ঠের বাক্সে রহিয়াছে। আসন ও পাদুকার বাক্সের মধ্যস্থলে মেঝেতে পুষ্পপাত্র ও কোষাকুষি রহিয়াছে। এই সকলের পূর্বদিকে ডান হাতে মহাপুরুষ নিজহাতে একখানা আসন পাতিয়া দিলেন। এই আসনে ব্রহ্মচারীকে বসিতে বলিলেন পশ্চিমাস্য। মহাপুরুষের সম্মুখে ঠাকুরের পাদুকা, বামহস্তে বেদিকার উপর ঠাকুরের প্রতিকৃতি। বেদিকার ভিতর চাবিবদ্ধ ঠাকুরের পবিত্র অস্থিপূর্ণ

'আত্মরামের' কৌটা। বেদিকার দক্ষিণে স্বামী বিবেকানন্দের ও উত্তরে শ্রীমাঠাকরুনের প্রতিকৃতি ক্ষুদ্র কাষ্ঠচৌকির উপর স্থাপিত।

কুষির জল ব্রহ্মচারীর হাতে দিয়া বলিলেন, আচমন করে নাও। তারপর এক একটি অর্ঘ সাজাইয়া ব্রহ্মচারীর হাতে দিতেছেন। আর নিজে এক একটি ব্রহ্মচর্যের মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। ব্রহ্মচারীও সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিতেছেন। বলিলেন, দাও এই অর্ঘটি ঠাকুরের পাদপদ্মে দাও। এইরূপে দ্বাদশটি মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া দ্বাদশটি অর্ঘ শ্রীপাদুকাতে উৎসর্গীকৃত হইল। প্রত্যেক অর্ঘ উৎসর্গের সঙ্গে সঙ্গে — 'ভবতু শুভায়, ভবতু শিবায়, ভবতু ক্ষেমায়' — এই প্রার্থনামন্ত্রটি চক্ষু নিমীলিত করিয়া শ্রীমহাপুরুষ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এইবার পুষ্পাঞ্জলি ও বেদীমূলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

বলিলেন, এই তোমার ব্রহ্মচর্য হয়ে গেল। ইচ্ছা হয় হোম কর, না হয় না কর। আমার কাছে যা আছে তা এই তোমায় দিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে তোমায় নিবেদন করে দিলাম। দেহ মন বুদ্ধি আত্মা — সব তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত হল। তোমার আর কিছু রইল না — সব তাঁর। এই তোমার ব্রহ্মচর্য, এই তোমার সন্ন্যাস — এই-ই সব।

শ্রীমহাপুরুষ আসন হইতে উঠিয়া পূর্ব দরজার কাছে গিয়া বলিলেন, মাদ্রাজে গিয়ে নিত্য ঠাকুরঘরে এইসব মন্ত্র পাঠ করবে, আর ঠাকুরকে (অঞ্জলিমুদ্রা দেখাইয়া) অঞ্জলি দেবে।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের মুখমণ্ডলে এক অপার্থিব আনন্দময় ভাবের প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। আর এক অপরূপ দিব্য ও পবিত্র আকর্ষণ মুখমণ্ডলে বিরাজিত।

গতকল্য শ্রীমহাপুরুষ এই ব্রহ্মচারীকে বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মচর্যের মন্ত্রগুলি ভাল করে পড়ে নাও। তাই মন্ত্রের আবৃত্তি আজ অতি সুমধুর হইয়াছে।

দক্ষিণের দরজা মহাপুরুষ খুলিয়া দিলেন। বারান্দায় শশধর (স্বামী মুকুন্দানন্দ) দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নাম হল? মহাপুরুষ সস্নেহে বলিলেন, শ্রীশচৈতন্য — ব্রহ্মচারী শ্রীশচৈতন্য।

ব্রহ্মচারী ধ্যানঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি কিছুকাল ধ্যান করিবার পর নিজ মনে ভাবিতেছেন, কি সৌভাগ্য আমার! আজ শ্রীভগবানের

অন্তরঙ্গ পার্ষদ সঙ্ঘপতি নিজহস্তে আমায় ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে উৎসর্গ করিলেন। এই তো প্রকৃত সন্ন্যাস! ঠাকুর, কৃপা করিয়া শক্তি দিও, যেন ইহার মর্যাদা রক্ষা করিতে পারি।

শ্রীমহাপুরুষের মধ্যাহ্নভোজন হইয়া গেল। ব্রহ্মচারী আসিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। তৎপর তাঁহার প্রসাদ লইয়া পঙ্গদে গিয়া ভোজন করিতে বসিলেন। পঙ্গদ ঠাকুরঘরের নিম্নতলে।

অপরাহ্ন চারিটা। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ দ্বিতলের ছোট ঘরে প্রবেশ করিয়া তক্তাপোষের উপর বসিয়াছেন দক্ষিণাস্য। সম্মুখে স্টুলের উপর গড়গড়া। তাহার লম্বা নলে এক একবার দুই একটা টান দিতেছেন। নিচে মেঝেতে কয়েকজন ভক্ত স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। মহাপুরুষের মন অন্তর্মুখ। মাঝে মাঝে দুই একটা কথা কহিতেছেন।

ব্রহ্মচারী শ্রীশচৈতন্য ও স্বামী নিষ্কামানন্দ (চিদাম্বরনাথ) দ্বিতলের গঙ্গার দিকের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইয়া আছেন ঘরের পূর্ব দরজার পাশে। তাঁহাদের উপর মহাপুরুষের দৃষ্টি পড়িতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কখন যাবে? তারপর হুঁকায় দুই একটা টান দিয়া মস্তক নত করিয়া কিছু ভাবিতেছেন। একটু পর মুখ তুলিয়া বলিলেন, গৈরিক কোথায়? ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন, আজ্ঞে আমার তো গৈরিক বস্ত্র নাই। সকালে আপনাকে এই কথা বললে আপনি বলেছিলেন, তা হবে এখন। এখান থেকে দেওয়া যাবে। বলেছিলাম? — শ্রীমহাপুরুষ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন, আজ্ঞে হাঁ।

‘ক্ষিতীন্দ্র ক্ষিতীন্দ্র’ বলিয়া শ্রীমহাপুরুষ তাঁহার সেবককে ডাকিতে লাগিলেন। সেবক আসিলে বলিলেন, দেখ তো আমার কাপড় আছে কিনা। সেবক উত্তর করিলেন, সব পরা-কাপড় আছে। পরা ছাড়া নাই? — বলিতে বলিতে সেবকসঙ্গে নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

খাটের নিচে ট্রাঙ্ক। মহাপুরুষ উপুড় হইয়া বসিয়া ট্রাঙ্ক খুলিয়া কাপড় দেখিতে লাগিলেন। পাশে সেবক। সাদা পাড়ের আধখানা অতি মিহি সুতার গৈরিক রং-করা কাপড় হাতে লইয়া ডাকিতে লাগিলেন — জগবন্ধু, ও জগবন্ধু। ব্রহ্মচারী নিকটে আসিলে বলিলেন, ন্যাও। এই বলিয়া গৈরিক বস্ত্রখানা তাঁহার হাতে দিলেন। বলিলেন, আর সব বস্ত্র

রং করে নিও। এইবার সেবক কৌপীন আনিয়া শ্রীমহাপুরুষেরই হাতে দিলেন। ইনি 'জয় গুরু, জয় গুরু' — এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কৌপীনখানি ব্রহ্মচারীর হাতে দিলেন। ব্রহ্মচারী টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন উত্তরাস্য। শ্রীমহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে দাক্ষিণাস্য হইয়া কৌপীন দিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ শৌচাগারে প্রবেশ করিলেন। সেবক ক্ষিতীন্দ্র ও প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারীকে নূতন গৈরিক বস্ত্র পরিতে বলিলেন। পাশের ছোট ঘরের ভিতরে গিয়া ব্রহ্মচারী শ্রীশচৈতন্য শ্রীমহাপুরুষের প্রদত্ত নূতন গেরুয়া বস্ত্র ও কৌপীন পরিলেন। আর গায়ে দিলেন স্বামী নিষ্কামানন্দের উত্তরীয়।

শ্রীমহাপুরুষ গৃহে আসিলে ব্রহ্মচারী শ্রীশচৈতন্য গিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। টেবিলের সম্মুখে। তিনি চক্ষু ভিতরে টানিয়া উচ্চারণ করিলেন, 'জয় গুরু, জয় গুরু'।

শ্রীমহাপুরুষ গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্বে ব্রহ্মচারী গৈরিক বস্ত্র পরিয়া টেবিলের পাশের জানালা ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। গদাধর আশ্রমের মহন্ত স্বামী কমলেশ্বরানন্দ তখন গৃহে প্রবেশ করিলেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন, এই দেখুন, কেমন সাজাচেছন। স্বামী কমলেশ্বরানন্দ বিস্ময়ানন্দে সহাস্যে উত্তর করিলেন — হাঁ, এই নূতন সন্ন্যাসী। বাঃ, বেশ দেখাচেছ তো!

ব্রহ্মচারীর সাদা বস্ত্র ও চাদর সেবক প্রহ্লাদ লইয়া গেলেন উত্তরের ছাদে। তিনি গৈরিক রং দিতেছেন বস্ত্রে। এদিকে ব্রহ্মচারী দৌড়িয়া গিয়া প্রেমানন্দ মেমোরিয়াল হইতে জামা আনিয়া সেবক প্রহ্লাদের হাতে দিলেন। তিনি সব কাপড় রাঙ্গাইয়া ছাদে দড়িয়ে শুকাইতে দিলেন।

গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া ব্রহ্মচারী শ্রীশচৈতন্য ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুরের চরণতলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ব্রহ্মচারী প্রার্থনা করিতে লাগিলেন - ঠাকুর আজ তোমার কৃপায় গৈরিক ধারণ করিবার সৌভাগ্য লাভ হইল। প্রভো, এর মর্যাদা যেন রক্ষা করিতে পারি, দায়িত্ব যেন পালন করিতে পারি। শক্তি দিও প্রভো!

মঠের দ্বিতলের আফিস ঘরে সাধুরা কেহ কেহ বসিয়া চা পান করিতেছেন — স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ, গঙ্গেশানন্দ প্রভৃতি। ব্রহ্মচারী ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার নূতন পোশাক দেখিয়া

সকলে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্বামী গঙ্গেশানন্দ সহাস্যে বলিলেন, এতক্ষণ বুঝি গৈরিক বস্ত্র লুকিয়ে রেখে দিছিলে?

এখন মাদ্রাজে যাত্রা করিবার সময় ঘনীভূত হইতেছে। ব্রহ্মচারী সকল মন্দিরে প্রণাম করিতে বাহির হইলেন। চন্দনতলায় ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বক্সীর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি পরিধানে গৈরিক দেখিয়া ব্রহ্মচারীকে আনন্দের আতিশয্যে হঠাৎ পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মচারী সঙ্কুচিত হইয়া পশ্চাতে অবগমন করিলেন। ডাক্তার আনন্দে বলিলেন, কখন গৈরিক ধারণ হলো? আহা, সিন্‌টা দেখতে পেলাম না!

সন্ধ্যার কিছু দেরী আছে। এখন সাড়ে ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ নিজকক্ষে চেয়ারে উপবিষ্ট দক্ষিণাস্য, টেবিলের সম্মুখে। জলযোগ করিতেছেন। সামনে একটি স্টুলের উপর একখানি রেকাবি। তাহাতে আছে দুইটি সন্দেশ, কিছু আঙ্গুর ও কমলালেবুর কোষ।

ব্রহ্মচারী বিদায় লইতে গৃহে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে স্বামী নিষ্কামানন্দ। তাঁহারা মাদ্রাজ মঠে যাইতেছেন সেবাকার্যে। এখন হাওড়া স্টেশনে যাইবেন। ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উভয়ে বলিলেন, এবার রওনা হব। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন — wait, wait (দাঁড়াও, দাঁড়াও)। তারপর নিজের হাতে রেকাবি হইতে কিছু ফল তুলিয়া উভয়ের হাতে দিলেন। তাঁহারা গমনোদ্যত। আবার বলিলেন, wait, wait (দাঁড়াও, দাঁড়াও)। আবার কিছু ফল দিলেন, সঙ্গে সন্দেশ।

এইবার আশীর্বাদ অভয় ও ভরসা প্রদান করিতেছেন। বলিলেন প্রশান্ত গম্ভীরভাবে — Yes, Guru Maharaj is always with you. He is with you, his bhaktas. He is with you, believe it! ঠাকুর সর্বদা তোমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি সর্বদা তাঁর ভক্তদের সঙ্গে থাকেন। তিনি তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন। বিশ্বাস কর। শেষের কথাগুলি এত অবিচলিত বিশ্বাস ও আন্তরিকতার সহিত বলিলেন যে, বিদায়প্রার্থী সেবকদের হৃদয়ে তাহা দ্রুত প্রবেশ করিয়া সুদৃঢ় ও গভীর রেখাপাত করিল।

মঠের প্রাচীন ম্যানেজার ও প্রবীণ মহাত্মা কেষ্টলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ব্রহ্মচারী শ্রীশচৈতন্য করজোড়ে শ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে নিবেদন করিলেন, মহারাজ, আমার নিজের বিদ্যাবুদ্ধির উপর বিশ্বাস নাই। বিশ্বাস আছে আপনার কথার উপর — আর আছে নির্ভরতা। শ্রীমহাপুরুষ সুদৃঢ় কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিলেন অভয় দিয়া, শ্রীগুরু মহারাজ সর্বদা সঙ্গে আছেন — বিশ্বাস কর।

বলিলেন, খাবার নিয়েছ সঙ্গে? ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন, আজ্ঞে না। স্বামী ধীরানন্দ বলিলেন, মহারাজ এ মুখচোরা। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, এত মুখচোরা হলে কি হয়, বাবা। এত মুখচোরা হলে জগতে, সংসারে চলে না।

ব্রহ্মচারী সাধুমণ্ডলীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া চলিলেন হাওড়া স্টেশনে, সঙ্গে নিষ্কামানন্দ। ভাণ্ডারের সম্মুখে রোয়াকে দাঁড়াইয়া আছেন স্বামী রামানন্দ অতি কষ্টে। তাঁহার লাম্বেগো ব্যাথা আছে। সোজা হইয়া তিনি দাঁড়াইতে পারেন না। তাই বাঁকিয়া গিয়াছেন। হাতে একটি মুখবন্ধ মাটির হাড়ি রজ্জুবদ্ধ। ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, এই নিন্ এটা। এতে রাত্রের আহার আছে — রুটি আর বেগুনভাজা। উনি কাহারও মুখে শুনিয়াছিলেন, মহাপুরুষ মহারাজের ঘরের কথা — ব্রহ্মচারী রাত্রের আহারের কোন ব্যবস্থা করেন নাই। তাই তিনি খাবার তৈরী করাইয়া রাখিয়াছেন। কি মহান হৃদয়। এ কেবল খাবারের ভাণ্ড নয় — প্রেমের ভাণ্ড। জয় ঠাকুর!

মঠের অঙ্গনে একটি ক্যাম্পখাট পাতা। তাহার উপর বসিয়া আছেন স্বামী গঙ্গেশানন্দ ও স্বামী নির্বাণানন্দ। স্বামী গঙ্গেশানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গী স্বামী নিষ্কামানন্দকে বলিলেন, he is your mate now (ইনি আজ থেকে তোমার সহকর্মী) — ঠাকুরের সেবক।

পাশে দাঁড়াইয়া আছেন নলিনী ও বিজয়। স্বামী গঙ্গেশানন্দ তাঁহাদিগকে বলিলেন, যা না, তোরা এদের স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আয়। ইঁহারাও চলিলেন সঙ্গে, হাওড়া। যাত্রীগণ পুরী এক্সপ্রেসে যাইতেছেন প্রথমে ভুবনেশ্বর। সেখান হইতে যাইবেন ওয়ালটেয়ার হইয়া মাদ্রাজে।

হাওড়া স্টেশনে বেলুড় মঠের সাধুদের ভিড় লাগিয়াছে। একদল যাইতেছেন হরিদ্বারে কুম্ভে, স্বামী প্রবোধানন্দের নেতৃত্বে। রাত্রি সাড়ে আটটায় পুরী এক্সপ্রেস ছাড়িল।

ব্রহ্মচারীর মনে প্রবল ঝড় চলিতেছে — গৈরিকের প্রতিক্রিয়া। তিনি ভাবিতেছেন, কি গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম! পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীম-র কৃপায় আমার এই ধর্মজীবন। তিনি সর্বদা বলিতেন, চব্বিশ ঘন্টা ভগবানের চিন্তা করিতে পারিলে গৈরিক ধারণের অধিকার জন্মে। কি করিয়া উহা সম্ভব আমার দ্বারা? শ্রীম-র শুভেচ্ছায় ও শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কৃপায় গেরুয়া গ্রহণ হইল বটে, কিন্তু সর্বদা, চব্বিশ ঘন্টা কি করিয়া ঈশ্বরচিন্তা সম্ভব হইবে? প্রাণপাত চেষ্টা করিয়া দেখিব। কিন্তু ভরসা একমাত্র ঠাকুর। চেষ্টা করিব সর্বকার্যে ঠাকুরকে স্মরণ রাখিতে। 'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ' — ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণরূপের এই মহাবাণী স্মরণ করিয়া ব্রহ্মচারীর হৃদয়ে সাহস ও ভরসা আসিল।

ব্রহ্মচারী গাড়িতে বসিয়া আরও ভাবিতেছেন, আজই পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীমহাপুরুষ ঠাকুরঘরে বলিয়াছিলেন, তোমার দেহ মন আত্মা — সব ঠাকুরের শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া দিলাম। তোমার আর কিছুই রহিল না। সব তাঁহার। চিন্তাও তাঁহার, কাজও তাঁহার। শরীর মন আত্মাও তাঁহার। এইভাবে শরণাগতিই একমাত্র পথ দেখিতেছি। এই সিদ্ধান্তে ব্রহ্মচারী শান্ত হইলেন। রাত্রির গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিল ভগবান জগন্নাথের পুরী। জয় গুরু। জয় গুরু।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ক্রাইস্ট পিটারকে বলেছিলেন, আমার সঙ্গে চলে এসো। তিনি জাল মেরামত করছিলেন — মৎস্যজীবী ছিলেন কিনা! বলেছিলেন, মাছধরা ছেড়ে দাও। মানুষ-মাছ ধরাবো তোমাকে দিয়ে। অর্থাৎ জগদ্‌গুরু তৈরী করাবেন। 'সংসার জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড' কিনা, ঠাকুর বলেছিলেন। লোকদের সন্তপ্ত চিত্তে ভগবানের কথামৃত শুনিয়ে শান্তি সুখের পথ দেখাবেন।

এই যে মহাপুরুষ গেরুয়া দিলেন, এর অর্থও তাই। গেরুয়া মানে, সন্ন্যাস। সন্ন্যাস মানে, ঈশ্বরের খাস লোক — আপনার জন। এঁদেরই বলে জ্ঞানী। আর গীতার কথায়, ভগবানের আপনার জন। অনন্ত জন্মের পর মানুষের ঈশ্বরলাভের বাসনা হয়। এখন অবতার এসেছেন, তাই এসব লোক দেখা যাচ্ছে যাঁরা সব ছেড়ে তাঁকে ধরেছেন। এঁদের দেখে অপরেও এ পথে যেতে চেষ্টা করবে। যাদের তিনি গৃহে রাখবেন তারা এঁদের সঙ্গে

মিশে সংসারে আবদ্ধ হবে না। ঠাকুর আসায় এসব কথা শোনা যাচেছ, এসব দৃশ্য দেখা যাচেছ। এ-ও জীবন্ত নাটক।

ডায়েরী পাঠ শেষ হইল। এখন ভক্তগণ শ্রীম-র কথামৃত শ্রবণ করিতে একত্রিত হইতেছেন।

আজ শনিবার, তাই অনেক ভক্তসমাগম। অনেক ভক্ত সপ্তাহে একদিন শ্রীমকে দর্শনের সুযোগ পান। ভাটপাড়ার প্রাচীন ভক্ত ললিত রায়, ভোলানাথ মুখার্জী প্রভৃতি আসিয়াছেন। নিত্যকার ভক্তগণও কেহ কেহ আছেন — পূর্ণেন্দু, বলাই প্রভৃতি। এখন অপরাহ্ন ছয়টা। স্বামী রাঘবানন্দও আসিয়া বসিলেন। ইনি শ্রীম-র কাছে থাকেন এখন, আমেরিকা হইতে ফিরিবার পর। ডাক্তার মতি মহারাজও আসিয়াছেন।

শ্রীম নিজের হাতে সাধুকে ক্ষীরের মিষ্টি দিলেন। মিষ্টিটা ছাঁচে তৈরী একটি মন্দির। বলিলেন, আপনি বাবা বৈদ্যনাথের কাছে যাচেছন। তাই মন্দিরটি আপনাকে উৎসর্গ করা গেল (হাস্য)। বেশ স্থান বৈদ্যনাথ! শিবের স্থান, যোগভূমি। খুব নির্জন পাহাড় আর বিস্তীর্ণ মাঠ। ঠাকুর গিছলেন। দেখবেন তো, ঐ স্থানটা উদ্ধার করতে পারেন কিনা যেখানে ছিলেন।

শ্রীম আর একটি মিষ্টি হাতে করিয়া আনিয়া বলিতেছেন, এটি স্ত্রীমূর্তি, ভাঙ্গতে হবে।

শ্রীম মুখ ধুইতে নিচে গেলেন। সাধু ও ভক্তরা নানাকথা কহিতেছেন। অনেক ভক্তও চলিয়া গেলেন। শ্রীম আসিয়া তুলসীতলায় সন্ধ্যা করিতে বসিলেন। বিনয় মহারাজ আসিলেন রাত্রি প্রায় আটটায়। তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রীম বলিলেন, তোমার জন্য eagerly wait (উৎসুক হইয়া অপেক্ষা) করছেন ইনি।

বিনয় মহারাজকে মিষ্টি নিজ হাতে খাইতে দিলেন। মাঝে মাঝে ভক্তদের সঙ্গে এ-কথা সে-কথা হইতেছে। জগবন্ধু উঠিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। শ্রীম বলিলেন — ও, আপনি আসছেন, আহা! মাঝে মাঝে good news (সুসংবাদ) লিখবেন।

বেলুড় মঠ, কলিকাতা।
১৫ই মার্চ, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার।

দশম অধ্যায়

শিবচিত্র

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। আজ ৯ই জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার। শ্রীম বসিয়া আছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। বেলুড় মঠ হইতে একজন সাধু আসিয়াছেন। তিনি একটার স্টীমারে কলিকাতা আসেন, ডাক্তার শ্যামাপদ মুখার্জীর বাড়িতে। তারপর জয়গোপাল সেনের বাড়িতে সুখেন্দুর সঙ্গে দেখা করিয়া অদ্বৈতাশ্রমে রাত্রিতে থাকিবেন এই সংবাদ দিয়া শ্রীম-র কাছে আসিয়াছেন।

সাধু প্রণাম করিলে তাঁহাকে বেঞ্চিতে বসিতে বলিলেন আর অতি আনন্দের সহিত মঠের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, কই আপনার ডায়েরী?

সাধু ডায়েরী শুনাইতেছেন।

আজ ১৬ই মার্চ, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার। মহাপুরুষের ঘর। সকাল সাতটা। অন্তেবাসী আসিয়া প্রণাম করিলেন।

মহাপুরুষ (করুণামাখা স্বরে) — জগবন্ধু, ভাল আছ?

অন্তেবাস — আজ্ঞে হাঁ। আজ যাব।

মহাপুরুষ — দেওঘর? যাও। জায়গা ভাল। গরম খুব। তা ওরাও (সাধুরা) রয়েছে।

অন্তেবাসী (অতি বিনীত স্বরে) — ঠাকুরকে একটু বলবেন যাতে তাঁর উপর ভক্তি বিশ্বাস হয়।

মহাপুরুষ — তা তুমি বলবে তোমার কথা। তুমি বললে কি তিনি শুনবেন না? তোমার কথা তুমি বলবে। তবে আমি বলছি, তোমার ভক্তি বিশ্বাস হোক। আমি তাই বলছি — তোমার ভক্তি বিশ্বাস হোক। খেয়ে যাবে তো? — কি খাবে?

অন্তেবাসী — ভাতে ভাত!

মহাপুরুষ — তা আর কি, খেয়ে যেও।

এখন পৌনে দশটা। এবার অন্তেবাসী দেওঘর রওনা হইবেন। শ্রীমহাপুরুষকে প্রণাম করিতে আসিলেন। মহাপুরুষ ঘরে দরজার সামনে ইজি-চেয়ারে উপবিষ্ট। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে বলিলেন, যাবে — এসো।

সেবক মতি হাতে একটি জপের মালা দিলেন শুদ্ধির জন্য। মহাপুরুষ বলিলেন, কি জপ করে দিতে হবে? (চোখ ও মুখের ইঙ্গিতে অন্তেবাসীর প্রতি) আচছা, এসো।

অন্তেবাসী খোকা মহারাজের ঘরে গেলেন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইতে। মতিকে পাঠাইয়া দিয়াছেন এই বলিয়া, 'বলে এস চিঠি লিখতে'।

অন্তেবাসী পুনরায় আসিলেন। তাঁহার মন যাইতে চাহে না মহাপুরুষকে আর মঠকে ছাড়িয়া। মহাপুরুষ বলিলেন, মাঝে মাঝে চিঠি লিখো। কেমন থাক, জানিও। আর ওখানে কাজও তত বেশী নাই।

অন্তেবাসী নীরবে মহাপুরুষের দিকে চাহিয়া আছেন — অন্তর চাহিতেছে না ছাড়িয়া যাইতে।

মহাপুরুষ (ধমক দিয়া) — কি বলেছি?

অন্তেবাসী (সবিনয়ে) — জানি না।

মহাপুরুষ — শরীর বুঝে কাজ নেবে। (বৃদ্ধা ও তর্জনী অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দিয়া দেখাইয়া) এইটুকু। (আবার ধমক, উত্তেজিতভাবে) এইটুকু। ওরা মানুষকে মেরে ফেলে।

অন্তেবাসী অতিরিক্ত কর্ম করিয়া মাদ্রাজে শরীর ভাঙ্গিয়া আসিয়াছেন। তাই তিনি মায়ের মত সাবধান করিতেছেন নিজে সঙ্ঘপতি হইয়াও।

অন্তেবাসী আফিস ঘর হইতে বাহির হইতেছেন সাধুদের প্রণাম করিয়া, মহাপুরুষ নিজের ঘর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসে যাবে? অন্তেবাসী বলিলেন, বাসে।

নিচে আসিলে স্বামী শাশ্বতানন্দ অন্তেবাসীকে একটি মোটর গাড়ীতে বসাইয়া দিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ, শশধর মহারাজ ও বৈরাগ্যানন্দ হাওড়া যাইবেন, তাঁহাদের গাড়ীতে। অন্তেবাসীর অন্তর কাঁদিতেছে, চক্ষু ছলছল।

স্বামী বোধাত্মানন্দ হাওড়ায় মিলিত হইলেন। ট্রেনেও একা কাঁদিতেছেন আর ভাবিতেছেন, — ঠাকুর আবার আমাকে ছাত্র পড়াইতে লইয়া যাইতেছেন। মন চায় থাকিতে ভূস্বর্গে, মঠে।

শ্রীম স্থির, দৃষ্টি আকাশে নিবদ্ধ। বলিলেন, সত্য, সত্যই এ কথা! সদ্য অবতার সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ ঠাকুরের সর্বত্যাগী পার্ষদদের হাট এই মঠ। এমন ভূস্বর্গ আর পাবে কোথায়?

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। আজ ৩রা জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার। দোতলার বারান্দা। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ পায়চারী করিতেছেন। এখন সকাল আটটা। গ্রীষ্মকাল। দেওঘর বিদ্যাপীঠের এখন গ্রীষ্মের ছুটি। দুইজন সন্ন্যাসী এইমাত্র বিদ্যাপীঠ হইতে আসিয়াছেন। ছুটিটা মঠে কাটাইবেন — স্বামী অজয়ানন্দ ও অপর একজন।

তাঁহারা মহাপুরুষকে প্রণাম করিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন একজন সাধুকে, তুমি এখন কোত্থেকে এলে? দেওঘর হইতে আসিয়াছেন জানিয়া স্বামী অজয়ানন্দকে সেখানকার স্কুলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সস্নেহে সঙ্গী সাধুকে বলিলেন, জগবন্ধু ভাল আছ?

আজ ৫ই জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। সন্ধ্যার একটু পূর্বে শ্রীমহাপুরুষ আসিয়া গঙ্গার ধারের বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন ছোট ঘরের পাশে — সামনে গঙ্গা। স্বামী বামদেবানন্দ পাশে দাঁড়াইয়া পাখা দিয়া হাওয়া করিতেছেন মশা যাহাতে পায়ে না বসিতে পারে। শ্রীমহাপুরুষের চক্ষু স্থির, শরীর ক্লান্ত। কিন্তু মন সতেজ ও সরস — অন্তরে নিবিষ্ট। নিচে মেঝেতে ভক্তরা কেহ বসিয়া আছেন।

আরতির ঘন্টা পড়িতেই সকলে চলিয়া গেলেন ঠাকুরঘরে। একটু পর চেতলার দুইজন ভক্ত আসিয়া প্রণাম করিলেন ও এ-কথা সে-কথা বলিতে লাগিলেন। একটি সাধু আজ সকালে প্রণাম করিতে পারেন নাই। তিনি গতকাল কলিকাতায় শ্রীমাস্টার মহাশয়ের কাছে ছিলেন। তাই তিনি প্রণাম করিবার মানসে প্যাসেজে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ এইবার উঠিয়া নিজের ঘরে যাইতেছেন। সাধুটি স্বামীজীর ঘরের পাপোশের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীমহাপুরুষ সামনে আসিলে

প্রণাম করিলেন। তিনি সহাস্যে বলিলেন, এই তোমার পুরানো ঘর। সাধু বিস্ময়ে ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য, এত অসুখেও সব কথা স্মরণ আছে! স্থিতপ্রজ্ঞের এই লক্ষণ। সাধু স্বামীজীর ঘরের সেবক ছিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, কই কোথায় গেলে? পেচছাব করতে হবে। স্বামী বামদেবানন্দ আসিয়া 'পিস পট' স্টুলের উপর রাখিলেন। নিচে বসিতে পারেন না, তাই দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিতেছেন — যেন শিশু, কোনও লজ্জা-সঙ্কোচ নাই। পরিহিত বস্ত্র একেবারে উপরে তুলিয়াছেন — যেমন শিশু করে। পরমহংস অবস্থা! ঠিক যেন বালক!

শ্রীম — ব্রহ্মদর্শন করে পরমহংস হয়েছেন কি না মহাপুরুষ! তাই এই বালকবৎ ব্যবহার। ঠাকুরের এই অবস্থা সর্বদা হত। কারও মনে কখনও বিন্দুমাত্রও সংশয় হতো না যে, তিনি পাঁচ বছরের শিশু নন। স্ত্রী-পুরুষ কারো মনে না। এই যে মহাপুরুষের কথা যা আপনি লিখেছেন, এ ঠিক পরমহংসের অবস্থা। বই পড়ে মানুষ এ কি বুঝিবে? তাই যারা এসব দেখে, ধন্য। সত্যধর্ম মানেই দর্শন। অবতার এলে এই সব দর্শন সর্বদা হয়। ধন্য যারা এসব দর্শন করে।

২

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

আজ গঙ্গা দশহরা, ৬ই জুন, শুক্রবার। আজ গঙ্গাপূজা ও স্নান করিলে কায়িক বাচিক ও মানসিক দশ প্রকার পাপ নাশ হয় বলিয়া শাস্ত্রবচন রহিয়াছে। তাই সমগ্র গঙ্গা অবতরণপথে পূজিতা হন।

শ্রীমহাপুরুষ দ্বিতলের স্বীয় কক্ষে চেয়ারে উপবিষ্ট, দক্ষিণাস্য। তাঁহার ডান হাতে দেয়ালের গায়ে টেবিল। তাহাতে পুস্তক, চিঠিপত্রাদি রহিয়াছে। শরীর রুগ্ন ও শীর্ণ। মাংস ও চর্বি শুষ্ক, আর গায়ের চর্ম ঝুলিয়া পড়িয়াছে। পৃষ্ঠদেশ বক্র, সোজা হইয়া বসিতে কষ্ট হয়। মাথার শিরা রোগযন্ত্রণায় ভাসমান। কিন্তু চক্ষুর দৃষ্টি সুস্থির। নয়নযুগল বৃহৎ, আর সম্মুখপ্রসারী ও ভাসমান। কি আশ্চর্য! চোখ দেখিয়া মনে হয়, ভিতরে যেন আর একটা আনন্দসাগর প্রবাহিত।

একজন সাধু ভাবিতেছেন, সাধারণ মানুষে আর এই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষে আকাশ পাতাল প্রভেদ বলিলেও বলা সম্পূর্ণ হয় না। অত দেহকষ্ট, কি করিয়া অন্তরের মনটি অমন নির্মল, স্বচ্ছ আনন্দময়! ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ দর্শন না করিলে শাস্ত্র পড়িয়া বা তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞের শাস্ত্রীয় লক্ষণের সম্যক্ বোধ হয় না। যেন দুইটি মানুষ, একটি রোগে ভুগিতেছেন — 'অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ' আর অপরটি দ্রষ্টা উদাসীন নির্বিকার প্রশান্ত আনন্দময়। আমরা মহা সৌভাগ্যবান, এই জীবনবৈভব নিজচক্ষে দেখিয়া ব্রহ্মজ্ঞের লক্ষণ যে কি, তাহা শিখিতেছি! এখন সকাল সওয়া ছয়টা। মঠের সাধুগণ একে একে আসিয়া শ্রীমহাপুরুষকে প্রণাম করিতেছেন। তিনি এখন আচার্যভাবে অবস্থান করিতেছেন। নিরুদ্বেগে প্রশান্ত স্বরে সস্নেহে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কাশীর স্বামী ভাগবতানন্দ (নরেন) আসিয়া প্রণাম করিতেই শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, জগদীশানন্দ চলে গেল! বেশ হয়েছে, ভালই হয়েছে, কারুকে ভোগালে না, নিজেও ভুগলে না। জ্ঞানী ছিল, পুত্রকন্যার উপর মায়া ছিল না। মায়া হয় কাছে থাকলে। তা ভালই হয়েছে। এই একটা chapter (অধ্যায়) শেষ হয়ে গেল। অনন্ত জীবন — তার একটা chapter (অধ্যায়) শেষ হ'ল। ভালই হলো কাশীতে বিশ্বনাথের স্থানে মুক্ত হয়ে গেল। দেখেছি বরাবরই quiet nature-এর (শান্ত প্রকৃতির) লোক ছিল।

স্বামী ভাগবতানন্দ — কারো কাছ থেকে সেবা নেবার ইচ্ছা ছিল না। আমরা বলছি, হাওয়া করবো — উনি বলতেন, না। কিছুই ইচ্ছা ছিল না, খাওয়া কি পরার।

শ্রীমহাপুরুষ — ভোগ ফুরিয়ে এসেছে, তাই।

সাধুগণ আসিতেছেন যাইতেছেন প্রণাম করিয়া। দুইটি একটি কথাও হইতেছে নানা বিষয়ে। এবার স্বামী ওঁকারানন্দের সঙ্গে কথাবার্তা হইতেছে।

স্বামী ওঁকারানন্দ — আজ দশহরা। এদিন ঠাকুরের কোনও বিশেষ ভাব হতো কি?

শ্রীমহাপুরুষ — আমার মনে নেই। (একটু ভাবিয়া) না, মনে নেই। তবে গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি বলতেন — খুব ভক্তি ছিল।

আমরা তখন ওখানে যেতুম। ঝাউতলায় বাহ্যে করে জলশৌচ করতুম

গঙ্গায়। এমনি চলছে অনেক দিন। একদিন তা লক্ষ্য করেছেন। আর বললেন, কোথায় গিছলে? বাহ্যে করতে গিছলাম বলায় জিজ্ঞাসা করলেন, জলশৌচ করলে কোথায়? গঙ্গায় করেছি শুনে বললেন, ও করিস্ না — গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি। এই এখানে ঘটি আছে। এতে জল নিয়ে জলশৌচ করবি। আর বলেছিলেন, হাঁসপুকুর থেকে জল নিয়ে যাবি।

স্বামী ওঁকারানন্দ — আচছা, ওটা কিভাবে বলতেন — ব্রহ্মবারি কি ব্রহ্মের বিশেষ প্রকাশ বলে?

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ, ব্রহ্মের বিশেষ প্রকাশ বলেই। আমরা তো আগে জানতুম না অত। উনি বললেন, তাই পরে বুঝলুম। শাস্ত্রেও ব্রহ্মবারি বলা হয়েছে — তাই উনিও তাই বলতেন। আস্তিক্য বুদ্ধি থাকলে অমনি হয় — সব বিশ্বাস করে, যা সব পূর্ব পূর্ব মহাত্মারা বলে গেছেন। তিনি বলতেন, সবই সত্য যা যা বলে গেছেন মহাত্মারা। এই ইংরেজী শিখে ছেলেরা হুট করে সব উড়িয়ে দেয়। তাঁর অমন ছিল না। সবেতে বিশ্বাস।

স্বামী ওঁকারানন্দ — আমাদের বুদ্ধি কত দূর? তাঁরা দূরদর্শী, দেখতে পান অনেক দূর। তিনি তো বলেছেন, কলিতে দারুব্রহ্ম, গঙ্গাবারি আর বৃন্দাবনের রজঃ — সাক্ষাৎ ব্রহ্ম।

দশহরায় কোথায় কিভাবে গঙ্গাপূজা হয় এই সব কথা হইতে লাগিল। আবার ঠাকুরের কথা উঠিল।

স্বামী ওঁকারানন্দ — শুনেছি, একদিন ভক্তরা সকলেই গঙ্গাস্নান করতে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। গিরিশবাবু যান নাই, ঠাকুরের ঘরেই বসে রইলেন। ঠাকুর বললেন, যাও না। গিরিশবাবু বললেন, আপনার কাছে রয়েছি — আর কোথায় যাব? ঠাকুর বললেন, আজ গঙ্গার বিশেষ আবির্ভাব। তাঁর কথায় গেলেন।

তারপর গঙ্গায় নেমে তাঁর কি একটা ভাব হলো আর অমনি জল ছিটিয়ে দিতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, সব পাপ দূর হয়ে যাবে।

শ্রীমহাপুরুষ — হতে পারে। তিনি (ঠাকুর) বললেই তো হয়ে যায়। ঈশ্বরীয় দর্শন সবই সত্য। সাধারণ লোক দেখতে পায় না, মন মলিন বলে। মন শুদ্ধ হলে সেসব ধরা যায় — যেমন wireless-এর message (বেতারের সংবাদ)। সর্বদাই কথা হচেছ, কিন্তু ধরতে পারা যায় যদি

receiver (গ্রাহকযন্ত্র) কাছে থাকে।

স্বামী ওঁকারানন্দ — শুনেছি, দেশে মা একবার ঠাকুরকে দর্শন করছেন। দেখলেন, তাঁর পা থেকে গঙ্গা বের হয়ে যাচেছ — জলের ধারা বয়ে যাচেছ। তারপর মা জবাফুল দিয়ে পূজো করলেন। কি একটা যোগ ছিল — মা গঙ্গাস্নানে আসতে পারেন নি বলে মনে একটু কষ্ট হয়েছিল। তাই ঠাকুর ও রূপ দেখালেন। মা পরে ভক্তদের ঐ জায়গাটা দেখিয়েছিলেন — 'এইখানে' বলে।

শ্রীমহাপুরুষ — হবে, ওঁদের দৃষ্টিই আলাদা। কারো কারো ধ্যান করতে করতে তাঁর কৃপায় ঈশ্বরীয় দর্শনাদি হয় আপনা আপনি।

স্বামী ওঁকারানন্দ — আচছা ধ্যান করায়, যে মূর্তিটির ধ্যান করবে তার তো স্বরূপের বোধ নেই, তবে সেইটি কি imagine (কল্পনা) ক'রে ধ্যান করা — শেষে খুলে যাবে স্বরূপটি আপনা আপনিই?

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ, তাতেই শেষে আপনিই বুঝবে স্বরূপ।

স্বামী ওঁকারানন্দ — যেমন দুধেতে পোকা আছে — এমনি চোখে তা দেখা যায় না, কিন্তু mycroscope (অনুবীক্ষণ) দিয়ে দেখা যায়, তেমনি মন যত ভাল হবে ততই সূক্ষ্ম জিনিস বোঝা যায়।

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ মহাকারণ — সবই তো রয়েছে! মন যত শুদ্ধ হবে ক্রমে সেইগুলি তত বোঝা যাবে। তবে ঐ মাইক্রোস্কোপ ভিতরেই রয়েছে — তৈরী করতে হয় না।

স্বামী ওঁকারানন্দ — সেটা মন?

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ মন। মনই তো সব। মনেরই অবস্থান্তর এই সব। স্থূল যা এখন দেখা যাচেছ — মন সূক্ষ্মে গেলে — এই স্থূল স্থূলই থাকবে। কিন্তু মনটা অন্য রকম হয়ে যাবে। তেমনি কারণ মহাকারণ। যা যেমন আছে তেমনি থাকে — কেবল মনটা বদলাচেছ।

কারণ সকলেরই এক। (ওঁকারানন্দের শরীর লক্ষ্য করিয়া) এর, (টেবিলের উপর পুস্তক লক্ষ্য করিয়া) এর, (ডান হাতের দেয়াল দেখাইয়া) আর এর — সকলেরই কারণ এক। কারণের তফাৎ নেই — কাগজের যে কারণ, দেয়ালেরও সেই কারণ। কারণ এক, কার্য ভিন্ন।

স্বামী ওঁকারানন্দ — মনটা ক্রমশঃ উপরে উঠে উঠে শেষে বিরাট

মনের সঙ্গে এক হয়ে যায় তখন সেই মনে সব বোঝা যায়।

শ্রীমহাপুরুষ — হাঁ, তাই।

শ্রীমহাপুরুষ এবার জলযোগ করিবেন। সাধুগণ বাহিরে চলিয়া যাইতেছেন। কথা এখানেই বন্ধ রহিল। এখন সকাল সাড়ে ছয়টা।

শ্রীম — ঠাকুর খুব জোর দিয়ে বলতেন, কলিতে ব্রহ্মদর্শন খুবই কঠিন। কিন্তু জগন্নাথের আটকা, বৃন্দাবনের রজঃ ও গঙ্গাবারি — এই তিনটিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলতেন।

মায়ের গঙ্গারূপ ঠাকুর দর্শন করেছিলেন। এসব মানতে হয়। উড়িয়ে দিলে হয় না। বিচার করতে যাও তো বহু দূরে। বিশ্বাস কর, তবে হাতের তলায়। ঠাকুর কৃপা করে ভক্তদের, সর্বজীবে তিনি, সর্ববস্তুতে তিনি — এ দেখিয়েছিলেন। ইংরেজী পড়ায় সরল বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। তাঁর কৃপায় ভক্তরা পুনরায় ফিরে পান।

৩

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

গঙ্গার দিকের বারান্দা। দ্বিতলে স্বামী সুবোধানন্দ ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন স্বামীজীর ঘরের গায়ে উত্তরাস্য। তামাক খাইতেছেন গড়গড়ায়, রবারের নলে। কয়েকজন সাধু দাঁড়াইয়া আছেন। দুইটি একটি এ-কথা, সে-কথা হইতেছে। স্বামী ওঁকারানন্দ আসিয়া প্রণাম করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন।

স্বামী ওঁকারানন্দ (স্বামী সুবোধানন্দের প্রতি চাহিয়া) — আজ দশহরা গঙ্গাপূজা। আপনি (পোস্তা দেখাইয়া) ঐখানে গঙ্গাদর্শন করেছিলেন?

স্বামী সুবোধানন্দ (সহাস্যে) — হাঁ। গান হচ্ছিল (ভিজিটার্স রুমে আরতির পর)। ওখানে (গঙ্গায় নামিবার সিঁড়ির বাঁ দিকে) পোস্তার উপর বসে পা ঝুলিয়ে — পাঁচ ছ' বছরের মেয়ে, খুব সুশ্রী। আমি এখানে বসে ছিলাম। মহাপুরুষকে ডেকে বললাম, এইতো পোড়ারমুখী বসে আছে মরতে। কাদের বাড়ির মেয়ে? অমনি ধপাস করে পড়ে গেল জলে।

স্বামী ওঁকারানন্দ — 'কালভয়বারিণি কপালিনী কালরূপিণী' — এ গান হচ্ছিল। দেখতে কেমন?

স্বামী সুবোধানন্দ — খুব সুন্দরী!

স্বামী ওঁকারানন্দ — বিজ্ঞানস্বামীও দেখেছিলেন। প্রয়াগে ত্রিবেণীতে স্নান করছেন অমনি দেখলেন একটি মেয়ে। পিঠে তাঁর তিনটি বেণী। (ব্রহ্মানন্দ) মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ঠিক, কি hallucination (মতিভ্রম)? উনি উত্তর করলেন, 'তুম তো মার দিয়া।'

স্বামী সুবোধানন্দ — ঠাকুরের দৃষ্টি আলাদা আর আমাদের দৃষ্টি আলাদা।

স্বামী ওঁকারানন্দ — আচ্ছা, আজের দিনে দশহরায় ঠাকুরের কোন ভাবটাবের কথা মনে আছে আপনার?

স্বামী সুবোধানন্দ — দশহরায় কাচা কাপড় পরে স্নান করতেন। আর মন খারাপ হলে একটু গঙ্গাজল খেতে বলতেন। আজের দিনে ওদিকে (হাওড়া পুলের দিকে) গঙ্গাকে বিরাট ফুলের মালা পরানো হত — এপার ওপার।

(সহাস্যে) অনেকের ভাব আমি ভেঙ্গেছি। ঠাকুরের কাছে যাঁরা যেতেন তাঁদের অনেকেরই ভাব হতো। দেবেনবাবু, মাস্টারমশায় প্রভৃতি অনেকে যেতেন - অনেকের ভাবাবেশ হতো। কারো কারো দাঁত মুখ খিঁচিয়ে যেতো।

ঠাকুর একদিন আমায় বললেন, যা না, ওখানে কীর্তন হচ্ছে। আমি বললাম — না, যাব না, কি দেখতে যাব? ওদের ভাব আমার ভাল লাগে না। তারপর উনি গেলেন, তখন তাঁর সঙ্গে গেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ওঁদের কার ভাব ঠিক? ঠাকুর বললেন, লেটোর। ওর বুকে পা না দিলে হুঁশ হয় না। শেষের দিকে লাটু মহারাজের ঐ রকম দর্শন হতো। ছাদে বসে আছি দুজনে, খুব গরম। বললেন, 'যাও, সেবাশ্রমে যাও। ওখানে দেখবে সব। এখানে কি?' আমি তো অবাক — লোক দেখছি না কা'কে বলছেন? তখন বললেন, এই মেয়েগুলো এসেছে। ওদের বললুম যেতে।

আমায় বলেছিলেন, থাক্ তুই এখানে। তুই ঠাকুরের ছেলে, তোর কোনও অভাব হবে না। আমার শরীর অসুস্থ শুনে বললেন, আমি রোজ একসের দুধের ব্যবস্থা করে দেবো — থাক্ এখানে পড়ে।

স্বামীজীর একদিন ভাব হয়েছিল কুটনো কোটে যেখানে শিবরাত্রিতে। গান গাইছিলেন, তানপুরা নিয়ে। নাকের সামনে তুলো ধরা হলো —

নড়ছে না। মহাপুরুষ তখন হাত থেকে তানপুরা নিয়ে গেলেন। স্বামীজী তখন কাত হয়ে পড়লেন। তাই দেখে মহাপুরুষ তখন তানপুরা বাজিয়ে 'হর, হর ব্যোম্ ব্যোম্' করতে লাগলেন। তখন হুঁশ হল। আর আমাকে বললেন, চল্ খোকা ঘুমুই গিয়ে। এই শুনে রাখাল মহারাজ আমাকে ইঙ্গিত করলেন নিয়ে যেতে আবার যদি ঐ সব হয়, এই ভয়ে। আমি নিয়ে গেলাম তাঁর ঘরে।

আমি এই (ছোট) ঘরে থাকি। শুনছি, স্বামীজী কথা কইছেন। ভাবলুম, কে এলো এ সময়ে। গিয়ে দেখি একা বসে। বললুম, কি স্বামীজী, কার সঙ্গে কথা কইছো? তিনি হেসে উত্তর করলেন, খোকা, একটু তামাক খাওয়া।

শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ নিজ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া প্যাসেজে স্বামীজীর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া আছেন নমস্কার মুদ্রায় — বলিতেছেন, 'জয় স্বামীজীর জয়'। 'জয় স্বামীজীর জয়।' পায়ে পায়ে চলেন টলিতে টলিতে। শরীর বাঁকিয়া যায় সামনের দিকে। স্বামী সুবোধানন্দ ইজি-চেয়ার হইতে উঠিতে চেষ্টা করিলেন। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, উঠো না — বস বস।

শ্রীমহাপুরুষ বারান্দার উত্তর-দক্ষিণে পায়চারি করিতেছেন। খালি গা, আধখানা পাতলা বস্ত্র পরিধানে, কাপড় সামলাইতে পারিতেছেন না, তাই মাঝখান হইতে ভাঙিয়া কোমরে গোঁজা। পায়ে লাল ভেলভেটের চটি। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছে, জরাব্যাধির হাত হইতে আত্মদ্রষ্টা পরমহংসেরও নিস্তার নাই। তবুও ইঁহারা মনের সম্রাট। মন সচ্চিদানন্দে সদা লগ্ন। জরামৃত্যুর সহিত অজর-অমরত্ব একসঙ্গেই দৃষ্ট হয় তাঁহাদের শরীরে।

শ্রীমহাপুরুষ দক্ষিণমুখী হইয়া ইজি-চেয়ারের সামনে দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী সুবোধানন্দ উত্তরাস্য ইজি-চেয়ারে বসা। স্বামী ওঁকারানন্দ রেলিং-এ পিছন দিয়া দাঁড়ান, তাঁহার বামদিকে ব্রহ্মচারী গদাধর পূর্ব-দক্ষিণ কোণে আর পশ্চিম-দক্ষিণে দাঁড়ানো অপর একজন সন্ন্যাসী। আবার গঙ্গাপূজার কথা উঠিল, পাঁঠাবলির কথা।

শ্রীমহাপুরুষ — একবার বরাহনগরে হয়েছিল।

স্বামী ওঁকারানন্দ — খোল বাজিয়ে পাঁঠাটাকে দেবত্বে বরণ মন্ত্রটি সকলেই সম্মিলিত কণ্ঠে আবৃত্তি করেছিলেন। স্বামীজী শিখিয়েছিলেন

এটি। এমনি ভাব হয়েছিল — পাঁঠা যেন সত্য সত্য দেবত্ব লাভ করল।

শ্রীমহাপুরুষ — মঠে বড় কেউ আসতো না। লোকেরা বলতো, শালারা খোল বাজিয়ে পাঁঠাবলি দেয়। মাস্টারমশায় আর কেউ কেউ এসে মাকে বললেন, এই কথা। মা তখন এপারে থাকতেন। মা ডাকিয়ে বললেন, 'কি কাজ বাবা যাতে অন্যের মনে কষ্ট হয়?' তারপর হয় নি আর।

স্বামী ওঁকারানন্দ — মঠের দুর্গাপূজায়ও স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল রুধিরকর্দম হবে — যেমন আছে শাস্ত্রে 'নবব্যাং রুধির কর্দমং।' মা নাকি বন্ধ করে দিছলেন। মাকে জিজ্ঞাসা করায় মা বললেন, না, থাক।

একজন সাধু — আচ্ছা, কাশীতে শঙ্কটাতে নাকি বলি হয়?

শ্রীমহাপুরুষ — না, কাশীর অন্য কোথাও 'বলি' হয় না — দুর্গাবাড়ি ছাড়া। না, আর কোথাও না।

একজন সাধু — পুরীর বিমলার মন্দিরে —

শ্রীমহাপুরুষ — সে অনেক রাতে হয় লোকজন সরিয়ে দিয়ে।

স্বামী ওঁকারানন্দ — একবার শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) দেখেছিলেন বলির মাথাটি বিল্বপত্রের মাঝে পরের দিন — নিতে ভুলে গেছে।

একজন সাধু — কালীঘাটের বলি কেউ বন্ধ করতে পারে নি।

শ্রীমহাপুরুষ — তাতো হবেই — বরাবরই হয়ে আসছে।

স্বামী সুবোধানন্দ (সহাস্যে) — মা এতকাল খাচেছন, দাঁত পড়ে না? (সকলের হাস্য)।

শ্রীমহাপুরুষ — বাবা, আমি এসব বুঝি না। তিনি মা, দয়াময়ী ত্রিতাপহারিণী — এই বুঝি। 'নিত্যৈব সা জগন্মাতা ত্বয়া ততমিদং জগৎ।' দেবতাগণ স্তবে প্রার্থনা করছেন —

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবী সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥*

স্বামী ওঁকারানন্দ চণ্ডীর নারায়ণী স্তুতির কিছু কিছু অংশ আবৃত্তি

---

*মা তুমি বিষ্ণুর শক্তি। তোমার পরাক্রম অনন্ত। তুমি এই বিশ্বের পরমবীজ। তুমি মহামায়ারূপিণী তোমার এই বিচিত্র মায়াতে, হে দেবী, এই সমস্ত বিশ্ব সম্মোহিত। কিন্তু তুমি প্রসন্না হলেই সংসারবন্ধন থেকে লোক মুক্ত হতে পারে।

করিতেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ — তিনি দয়াময়ী ত্রিতাপহারিণী, জগতের কল্যাণের জন্য আসেন। নানা রূপ তাঁর। যখন যে রূপেই আসুন — তা জগতের কল্যাণের জন্য আসেন। তাঁ’তে অমঙ্গল অকল্যাণ নেই। তিনি যে সর্বমঙ্গলা। কল্যাণ করা ছাড়া তাঁর আর অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই। তাঁর কিসের অভাব — ‘নানাবাপ্তমবাপ্তব্যম্ বর্ত এব চ কর্মণি।’ নিজের অপ্রাপ্য কিছুই নেই। তবুও জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করেন। তাঁর সাকার ভাবটি জগতের কল্যাণের জন্য (তাঁহার দৃষ্টি গঙ্গা ও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের দিকে)। তাঁর হৃদয় দয়া, ভালবাসা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ।

একজন সাধু (স্বগতঃ) — হরপার্বতী প্রভৃতি দেবরূপ, এবং রাম-কৃষ্ণাদি অবতার-রূপেরই কথা বলছেন কি — সাকার ভাবটি জগতের কল্যাণের জন্য — এই উক্তি দ্বারা? এক সত্যবস্তু পরব্রহ্মেরই এই নানা সাকার রূপ — যতক্ষণ না পরব্রহ্মে লীন হয় জীব ততক্ষণ এই সবই সত্য।

শ্রীমহাপুরুষ এবার নিজের ঘরের দিকে যাইতেছেন, সঙ্গে সাধুরা। প্যাসেজের পশ্চিম প্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, আমার বাবা ছিলেন শাক্ত। ছেলেবেলায় দেখেছি জগদ্ধাত্রীপূজাতে পাঁঠা কেটে তার মাথাটা নিজের শিরে রেখে চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করছেন — সমস্ত রক্তে রক্তাক্ত। আমার এসব ভাল লাগে না — এ কি, জ্যান্ত জানোয়ারটা কাটা! ওসব রাজসিক ব্যাপার! ঠাকুর বলতেন, মার এমন সব রূপ আছে যা এর গন্ধ শুঁকতে পারে না।

শ্রীমহাপুরুষ নিজকক্ষে প্রবেশ করিলেন। এবার বিশ্রাম করিবেন, বৃদ্ধ শরীর তাই। এখন সকাল সাড়ে সাতটা।

আজ ৮ই জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার। সকালে শ্রীমহাপুরুষ নিজকক্ষে চেয়ারে বসিয়া আছেন দক্ষিণাস্য, টেবিলের সামনে সাধুরা প্রণাম করিতেছেন আর যথোপযুক্ত বাক্যে সকলকে স্নেহাশিস বিতরণ করিতেছেন নিজের শরীরের অসুখ ভুলিয়া। নলিনী (সারদেশ্বরানন্দ) প্রণাম করিতেই সহাস্য বলিতেছেন।

‘নলিনীদলগত জলমতি তরলং। তাবৎজীবনং অতিশয় চপলং।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে॥

৪

ডায়েরী পাঠ শেষ হইল।

শ্রীম (পাঠান্তে) — এ দেবদেবী সব সত্য। এতে আর আশ্চর্য কি? তিনি এই বিচিত্র অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হয়েছেন, আর এই সব নানা রূপ হতে পারেন না — দেবদেবীরা? ঠিক কথা। তাঁর কৃপা হলে চিত্ত একেবারে শুদ্ধ হয়ে যায় আর তা'তে তাঁর নানা রূপ দর্শন হয়।

ঠাকুর কি শুধু বলতেন, এ সব সত্য? ভক্তদের আবার সব দেখিয়ে দিয়েছেন — সাকার নিরাকার, সব। বেশী দেখালে আবার সইতে পারে না। অর্জুনের তা হয়েছিল। তাই যতটা সয় ততটাই দেখান।

ঠাকুর কে? এ ব্রহ্মশক্তিই ঠাকুর — যিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। শক্তি ব্রহ্ম অভেদ। ঠাকুর ও মা, শক্তি ও ব্রহ্ম। ঠাকুর ও মা অভেদ।

এখন সন্ধ্যা সমাগতা। শ্রীম তুলসীতলায় নীরবে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। আশে পাশে বসা স্বামী রাঘবানন্দ, মোটা সুধীর, পূর্ণেন্দু প্রভৃতি। দুইটি মালাবারী যুবকও বসিয়া আছেন।

ধ্যানান্তে শ্রীম দক্ষিণে নিজের আসনের দিকে আসিতেছেন। মধ্য রাস্তায় একজন সাধু শ্রীমকে আবার প্রণাম করিলেন পায়ে হাত দিয়া। অন্ধকারে চিনিতে না পারিয়া বলিলেন, দেখি কে? সাধু বলিলেন, জগবন্ধু। শ্রীম আনন্দে সহাস্যে বলিলেন, ও জগবন্ধু! ন্যাড়া হয়েছ — এখানে এসে হয়েছ?

শ্রীম চেয়ারে বসিয়া আছেন উত্তরাস্য। তাঁহার বাঁ হাতে জোড়া বেঞ্চিতে সাধুরা। সামনে ও ডান হাতে অপর বেঞ্চিতে ভক্তরা। মাদ্রাজী যুবক দইটি গিয়া শ্রীমকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। শ্রীম সাধুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, এরা বুঝি স্টুডেন্টস্? সাধু বলিলেন আজ্ঞে হাঁ। এরা দু'ভাই, মাদ্রাজ মঠে আসে। স্বামী ঘনানন্দের মামাতো ভাই। মালাবারবাসী।

শ্রীম (অতি আনন্দে) — দেখ, তিনি (ঠাকুর) আসায় সব দেশটা যেন একটা family-তে (পরিবারে) পরিণত হয়েছে।

সুরেন চক্রবর্তীর প্রবেশ।

বড় জিতেনবাবু (জিতেন্দ্রনাথ সেন) হাইকোর্টের বেঞ্চ ক্লার্ক। তিনি একটা এ্যালুমিনিয়ামের বড় পাত্রে অনেক সিঙ্গাড়া করিয়া পাঠাইয়াছেন। জিতেনবাবুর ছেলের হাত হইতে পাত্রটা দুই হাতে লইয়া চোখ বুঁজিয়া নিবেদন করিয়া সাধুদের সামনে ধরিলেন।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — আপনারা দু'টি করে নিন্। (সুরেন চক্রবর্তীর সামনে ধরিয়া) নিন্, আপনি নিন্।

সুরেন চক্রবর্তী — আমার আহ্নিক হয় নি।

শ্রীম — সে কি! সাধু হলেন নারায়ণ। অমন সাধু যখন নিয়েছেন, তখন প্রসাদ। অমন প্রসাদ কি পাওয়া যায়? নিন্, নিন্।

কিন্তু সুরেনবাবু কিছুতেই নিলেন না।

একটি সাধু (স্বগতঃ) — কি আশ্চর্য! মহাপুরুষ ভগবানের অন্তরঙ্গ পার্ষদ, নিজ হাতে দিচেছন, উনি নিচেছন না। লোকটি তীক্ষ্ণবুদ্ধি নন্ দেখছি। যার জন্য আহ্নিক সেই জিনিস সামনে বসে, চিনতে পারছেন না। অতবড় পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম আর অত নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ — তিনি কিন্তু এর বিপরীত কাজ করেছিলেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রসাদী জগন্নাথের চন্দন ও তুলসী দিলে — শৌচাদির পূর্বেই মস্তকে ধারণ করে মুখে দিয়ে দিলেন।

সুরেনবাবু এম.এ. পাস। মায়ের মন্ত্রশিষ্য। মেডিক্যাল কলেজের সেক্রেটারী।

শ্রীম গিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিলেন। সাধু ভক্তদের কীর্তন করিতে বলিলেন। খোল আছে কিন্তু বাজাইবার লোক নাই।

শ্রীম (সহাস্যে একজন সাধুর প্রতি) — জগবন্ধুবাবু, জান না? শিখে ফেল না। বরানগরে স্বামীজী ওঁদের (ঠাকুরের সন্তানদের) গান বাজনা শেখাতেন। রাখাল মহারাজ, তারক মহারাজ এঁরা তবলা জানতেন। শরৎ মহারাজ গান বাজনা দুই-ই জানতেন।

ভক্তগণ হাততালি দিয়া কীর্তন করিতেছেন — 'রাধে গোবিন্দ জয়, শ্রীরাধে গোবিন্দ জয়।'

শ্রীম কিছুক্ষণ শুনিয়া ঘরে গিয়া নৈশ ভোজন করিতে বসিলেন। পাছে ভক্তগণ অন্য কথা ক'ন ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া, শ্রীম ভক্তদের এইরূপ

— পাঠশ্রবণে, কিংবা কীর্তনে রত রাখিয়া ভোজন করিতে যান।

ঘরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মেঝেতে বসিয়া আহার করিতেছেন দুধ ও রুটি — চিনি ছাড়া। একটা প্লেটে ঢালিয়া দুধ পান করিতেছেন। একজন সেবক সামনে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। বলিলেন, জগবন্ধুবাবুর খাবার আনা হয় নি? সেবক বলিলেন, উনি অদ্বৈতাশ্রমে চলে যাবেন।

সাধু শ্রীমকে দর্শন ও যুক্তকরে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

অদ্বৈতাশ্রম, ৪, ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা।
৯ই জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, সোমবার।

একাদশ অধ্যায়

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ

১

মর্টন স্কুল। আজ ১৯শে জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। সন্ধ্যার একটু দেরী আছে। শ্রীম ঘর হইতে ছাদে আসিয়া বসিলেন। ছাদে স্বামী রাঘবানন্দ উপবিষ্ট। আরও কয়েকজন ভক্ত আছেন। স্বামী নিত্যাত্মানন্দও আসিয়া শ্রীম-র অপেক্ষায় ছিলেন। সকলে উঠিয়া শ্রীমকে যুক্তকরে নমস্কার করিলেন। শ্রীমও প্রতিনমস্কার করিয়া কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীম (স্বামী নিত্যাত্মানন্দের প্রতি) — আপনি কোত্থেকে এলেন?

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ — এখন আসছি 'বসুমতী' আফিস থেকে। মাদ্রাজ মঠের জন্য একটি মাসিক 'বসুমতী' বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। মঠ থেকে বেরিয়েছি একটার স্টীমারে।

একজন সাধু শ্রীম-র অনুমতি লইয়া বেলুড় মঠের ডায়েরী পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন।

আজ জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা। ১০ই জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার। জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রাও আজ। এই দিনেই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়।

এখন সকাল ছয়টা। শ্রীমহাপুরুষ বিছানায় বসিয়া আছেন। সাধুরা প্রণাম করিতেছেন। প্রণামান্তে কেহ চলিয়া যাইতেছেন। দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন — অসঙ্গানন্দ, অজয়ানন্দ, জ্যোতির্ময়ানন্দ, ভোলানাথ, নিত্যাত্মানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ।

শ্রীমহাপুরুষ (স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দের প্রতি) — আজ স্নানযাত্রা। 'আত্মারাম'কে (ঠাকুরের অস্থিকৌটা) বার করলে বেশ।

আজ অসঙ্গানন্দ প্রভৃতিকে লইয়া নিত্যাত্মানন্দ দক্ষিণেশ্বর গেলেন। আর ওখানকার যদু মল্লিক ও শম্ভু মল্লিকের বাড়ি ও অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণ-

পদরজঃপূত পুণ্যভূমিসমূহ দর্শন করিলেন। হিমাংশু দক্ষিণেশ্বর ফটকে প্রসাদ দিলেন সাধুদের হাতে। উনি কলিকাতায় ফিরিতেছেন।

বেলুড় মঠ। ১২ই জুন ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ সাল। শ্রীমহাপুরুষের কক্ষ। এখন সকাল ছয়টা কুড়ি মিনিট। খুব গরম পড়িয়াছে, তাই শ্রীমহাপুরুষ নগ্ন গাত্রে বিছানায় বসিয়া আছেন, পশ্চিমাস্য। পিঠ বাঁকিয়া যাইতেছে বসিতে। সহাস্য বদন। ব্রহ্মচারী বিমল ও দেওঘরের ব্রহ্মচারী ভোলানাথ প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

একটি সাধু ঘরে ঢুকিতেই, সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নাম হলো তোমার? সাধু অগ্রসর হইয়া খাট ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর করিলেন, নিত্যাত্মানন্দ। মহাপুরুষ মহারাজ মন অন্তরে রাখিয়া আবৃত্তি করিলেন, 'নিত্যাত্মা'।

ঘরে একটা বোলতা ঢুকিয়াছে। গড়গড়ার লাল রবারের নলে বসিয়াছে। গড়গড়া শ্রীমহাপুরুষের সামনে স্টুলের উপর। মাঝে মাঝে একটা টান দিতেছেন। বোলতাটাকে তাড়াইতে হইবে। শ্রীমহাপুরুষ এদিক ওদিক দেখিতেছেন। সাধু বুঝিতে পারিলেন, পাখা খুঁজিতেছেন। তাই সাধু বলিলেন, পাখা খুঁজছেন? উনি উত্তর করিলেন — হাঁ, দাও তো পাখাটা। পাখা বিছানায় বালিশের পাশেই ছিল। সাধু পাখা দিয়া বোলতাটাকে বাহির করিয়া দিলেন।

বোলতা আবার আসিয়াছে। ঘরের উত্তর-পশ্চিম জানালার গায়ে বসিয়াছে। সারশি বন্ধ। সাধু উহা দেখিতে পান নাই। দক্ষিণ-পশ্চিম জানালাও বন্ধ। একটা মশা ঐ জানালার গায়ে উড়িতেছে। সাধু পাখা দিয়া উহাকে বাহির করিতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, আবার এসেছে, দাও দাও, বের করে দাও — জানালা খুলে। সাধু দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের জানালাটা খুলিতেছেন দেখিয়া শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন, না এটা নয় ওটা। সাধু তখন বোলতাকে দেখিতে পাইয়া পশ্চিম-উত্তরের জানালাটা খুলিয়া বোলতাকে তাড়াইয়া দিলেন। বোলতাটাকে সাধু দেখিতে পান নাই বলিয়া লজ্জিত হইলেন।

মিশনের ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল স্কুলের একটি ছেলে ভট্টাচার্য আসিয়া প্রণাম করিল। শ্রীমহাপুরুষ ফষ্টিনষ্টির ভাবে হাসিয়া বলিলেন, কি গুরুকুলের

ভট্টাচার্যী — দশকর্ম শিখছিস্? কুলধর্ম নষ্ট করতে নেই। ছেলেটি উত্তর করিল, বড় ভাই আর মেজো ভাই ঐ সব করছেন। শ্রীমহাপুরুষ রহস্যচ্ছলে বলিলেন, আর তুই কি শিখছিস্ — তাঁত? ভট্চার্যীর ছেলে হয়ে শিখছিস্ তাঁত (হাস্য)। তা ভাল। আজকাল যে দিন পড়েছে ওসব একটু শেখা ভাল।

শ্রীমহাপুরুষ জলযোগ সারিয়া নিত্যকার মত আজও দোতলার বারান্দায় পায়চারী করিতেছেন উত্তর-দক্ষিণ। সঙ্গে স্বামী ভাস্বরানন্দ ও ব্রহ্মচারী শৈলেশ। একটি সাধু স্বামীজীর ঘরে বসিয়া ধ্যানজপ করেন — উদ্দেশ্য এখান হইতে প্রায়ই শ্রীমহাপুরুষকে দর্শনের ও তাঁহার কথা শুনিবার সুবিধা হয়। মহাপুরুষ আসিতেছেন দেখিয়া উনি স্বামীজীর ঘরের বাহিরে গিয়া প্যাসেজে দাঁড়াইলেন। টলিতে টলিতে শ্রীমহাপুরুষ ফিরিয়া আসিলেন, ক্লান্ত। দারুণ গরম। প্যাসেজ দিয়া যাইয়া অফিসঘরে ঢুকিলেন। এখন সকাল, সওয়া সাতটা বাজিয়াছে।

শ্রীমহাপুরুষ নিজ কক্ষে আসিয়া খাটের উপর বসিয়াছেন। এখন সাড়ে আটটা, তিনি বিশ্রাম করিবেন। স্বামী প্রণবানন্দ আসিয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীমহাপুরুষ (স্বামী প্রণবানন্দের প্রতি) — জগন্নাথের স্নানযাত্রা হয়ে গেল। এইবার অসুখ হবে।

স্বামী প্রণবানন্দ — পাঁচন খাওয়াবে।

শ্রীমহাপুরুষ — কলমীর বিছানায় শোয়াবে আর পটলের বালিশ মাথায় দেবে।

স্বামী প্রণবানন্দ — আজ্ঞে হাঁ। পটল খাওয়া উঠে গেল। কলমী আর পটল ব্রাহ্মণের বিধবা যতিরা (স্ত্রীলোকেরা) খাবে না।

শ্রীমহাপুরুষ (বালকের ন্যায় মুক্ত হাস্যে) — কেমন করে এসব প্রথা এলো, কে জানে?

স্বামী প্রণবানন্দ — পটলেও এখন সোয়াদ নাই।

শ্রীম — স্থিতপ্রজ্ঞের সব আচরণই মূল্যবান। আহার শয়ন ভ্রমণ চিন্তন, সবই মূল্যবান। Watch করে (নিরীক্ষণ করে) দেখলে দেখতে পাওয়া যায় এসবের ভেতর দিয়েও ব্রহ্মজ্ঞান উঁকি মারছে। তাঁদের এসব ব্যবহার সাধারণ লোকের মত নয়। সব আচরণ ব্রহ্মরসে রঞ্জিত। ব্রহ্মজ্ঞের সকল আচরণের

ভেতরই চুম্বকের ন্যায় একটা আকর্ষণ শক্তি রয়েছে। সত্যিকার ভক্তগণ তা দেখতে পায়। মহাপুরুষের ছোট ছোট কথা ও আচরণের ভিতর ঐ আকর্ষণ রয়েছে। তাই সবই মূল্যবান।

২

ডায়েরী পাঠ চলিতেছে।

বেলুড় মঠ। ১৪ই জুন ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার — ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ সাল। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। সকাল সওয়া ছয়টা। গরমের পর বৃষ্টি হওয়ায় ঠাণ্ডা হইয়াছে। তিনি প্রসন্ন চিত্তে খাটে বসিয়া আছেন আচার্যভাবে। সহাস্য বদন। অত অসুখ, কিন্তু কোনও চিহ্ন নাই চোখে মুখে। পুরুষসিংহের শরীরই জরাগ্রস্ত, কিন্তু মন সিংহতুল্য। কি বলিষ্ঠ, সরস, জ্যোতির্ময় ও চিন্তালেশশূন্য!

সাধুরা আসিতেছেন, চলিয়া যাইতেছেন প্রণাম করিয়া। সহাস্য বদনে সকলকে তাঁহার স্নেহাশিস্ বর্ষণ করিতেছেন এই জরাগ্রস্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ!

আজ বায়ুমণ্ডল সুশীতল হওয়ায় স্তবপাঠ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। 'বৃহৎ স্তবকবচমালা'—খানা আনাইয়া স্বামী অসঙ্গানন্দের হাতে দিয়া বলিলেন, রাবণকৃত শিবের স্তবটা বের করে দাও তো!

ঘরে এখন অসঙ্গানন্দ, শাশ্বতানন্দ, জিতাত্মানন্দ, নিত্যাত্মানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ দাঁড়াইয়া শ্রীমহাপুরুষকে দর্শন করিতেছেন আর শুনিতেছেন, এই জরাগ্রস্ত শরীরেও জীবন্মুক্ত 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য,' 'স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত'। আর দেখিতেছেন, 'কিমাসীত ব্রজেত কিম্।' (গীতা ২-৫৪)

শ্রীমহাপুরুষ খাটে বসিয়া রাবণকৃত মহাদেবের স্তবটি একটু একটু পড়িতেছেন, বালকের মত একটি একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া।

> জটাটবী-গলজ্জল-প্রবাহ-পাবিত-স্থলে
> গলেঽবলম্ব্য লম্বিতাং ভুজঙ্গ-তুঙ্গ-মালিকাম্।
> ডমড্-ডমড্-ডমান্নিনাদবড্ ডমর্বযং
> চকার চণ্ডতাণ্ডবং তনোতু নঃ শিবঃ শিবম্॥ ইত্যাদি।

কতক অংশ পাঠ করিয়া শ্রীমহাপুরুষ সহাস্যে বলিতেছেন, হাঁ, ঠিক

রাবণের মতই হয়েছে। যেমনি ভাষা, তেমনি শব্দবিন্যাস আর তেমনি স্বর!

এ সবই ভালর জন্য। শিবের তাণ্ডব নৃত্য — এও জগতের কল্যাণের জন্য। তিনি তো সর্বমঙ্গলময়— তাই তো তাঁর নাম শিব — 'শিব' মানে মঙ্গল, কল্যাণ।

(স্মরণ করিয়া সহাস্যে) স্বামীজীর গানটিও বেশ। আবেগভরে উচ্চ রাগিণীতে গাহিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার দম বন্ধ হইয়া যাইতেছে হাঁফানীর জন্য। আরম্ভ করিলেন, হর হর মহাদেব—। এক পদ গাহিতেছেন, অমনি বন্ধ হইতেছে আবার আর একপদ গাহিতে চেষ্টা করিতেছেন, পারিতেছেন না। বলিতেছেন, শরীরের জন্য পারি না — আগে গাইতে পারতাম।

জলখাবার আসিয়াছে। একটু হরলিকস্ ও দুইখানা সন্দেশ। সাধুগণ সকলে বাহিরে গেলেন। বালকের মত খাইতেছেন।

স্বামী প্রণবানন্দ আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। উনি প্রায়ই এই সময় আসেন। তিনি মঠের ডাক্তার। পাড়ার সকলের সংবাদ দিতেছেন, নানা কথা হইতেছে।

স্বামী প্রণবানন্দ — ঠাণ্ডা পড়েছে মহারাজ। আরাবিয়ায় সকালে এমনি ঠাণ্ডা — হিমালয়ের কাছে কি না!

শ্রীমহাপুরুষ — বেশ ঠাণ্ডা।

স্বামী প্রণবানন্দ — গুমোট গেল।

শ্রীমহাপুরুষ — আবার হবে।

জলযোগ করিয়া শ্রীমহাপুরুষ দোতলার বারান্দায় গেলেন। স্বামীজীর ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, জয় গুরু মহারাজ, জয় স্বামীজী। একটি সাধু অফিসঘরে দাঁড়াইয়া ইহা শুনিলেন। আজকাল প্রায় রোজই স্বামীজীর ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া করজোড়ে এই জয়গান করেন।

সাধু অফিসের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, বারান্দায় প্যাসেজের সামনে মাদ্রাজ মঠের ব্রহ্মচারী দামু শ্রীমহাপুরুষকে প্রণাম করিতেছে। আর তিনি তাহার সহিত বালকবৎ ফষ্টিনষ্টি করিতেছেন। বলিতেছেন, দামোদরম্ কেমনম্ আছস্? (বালকের দুষ্ট হাস্য)। হাস্যকৌতুক করিতে করিতে আসিয়া চেয়ারে বসিলেন ছোট ঘরের সামনে চেয়ারে। সম্মুখে পতিতপাবন

জাহ্নবী। আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া পুনরায় বলিতেছেন, ওদের দেশে দক্ষিণে সবেতে 'ম্' লাগায় — বলে 'নমস্কারম্'।

একটু পরেই আবার উঠিয়া অফিসঘরে আসিতেছেন — গায়ে পাতলা ফতুয়া, পরনে দুই ভাঁজ পাতলা তাঁতের ছোট ধুতি। পায়ে লাল ভেলভেটের চটি। টলিতে টলিতে সম্মুখে ঝুঁকিয়া অগ্রসর হইতেছেন।

একটি সাধু তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন আর আনন্দে ভাবিতেছেন, আমরা নিশ্চয় সৌভাগ্যবান — জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ অবতারের পার্ষদকে দর্শন করতে পারছি রোজ! এ দর্শন সত্যই সুদুর্লভ! লক্ষ লক্ষ জন্মের পর শ্রীভগবানের কৃপায় মানুষের পরমতত্ত্ব ব্রহ্মদর্শন হয়। এই মহাপুরুষের সেই ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন হয়েছে, তিনি কৃতকৃত্য। আমরাও ধন্য, এঁরা আমাদের ভালবাসেন, অভয় প্রদান করেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ অফিসঘরে গিয়া পূর্ব-দক্ষিণের জানালার পাশে চেয়ারে বসিলেন, উত্তরাস্য। স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ দরজার সামনে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীমহাপুরুষের সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি অতি কাতর স্বরে তাঁহাকে আত্ম-নিবেদন করিতেছেন।

স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ — মহারাজ, মনটা এই বেশ থাকে, আবার খারাপ হয়ে যায়। ভাল থাকার সময় মনে হয় — এমন থাকলে বেশ হয়। ধ্যান জপও করতে পারি না তেমন — মাথা কেমন হয়ে যায়।

মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) কাছে শুনেছি — material things (জাগতিক জিনিস) ভেবে ভেবে সাধুর পতন হয়ে যায়। ধ্যান জপ করলে সেইটা হয় না। মহারাজ বলতেন, এ বিশ্বাস বিশ্বাসই নয়। ধাক্কায় পড়লে ভেসে যায়।

শ্রীমহাপুরুষ (সস্নেহে) — কি আর করবে? স্মরণ মনন করতে থাক। আর প্রার্থনা করবে — 'ভক্তি বিশ্বাস দাও, হে প্রভো, হে দয়াময়! হে শিব, আমায় ভক্তি বিশ্বাস পবিত্রতা দাও!' সর্বদা প্রার্থনা করবে। আর কি করতে পার? ধ্যান করতে পার না বেশী, জপ করতে পার না বেশী। আর কি করবে — সর্বদা প্রার্থনা করা, 'হে প্রভো দয়াময়, আমায় ভক্তি বিশ্বাস দাও।' এতেই হয়ে যাবে। সর্বদা প্রার্থনা করবে।

সেবক মতি ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সাধুরা বাহিরে

দাঁড়াইয়া এক অমুল্য উপদেশ শুনিতেছিলেন। তাহাতে কিঞ্চিৎ বাধা পড়িল।

স্বামী মুক্তশ্বেরানন্দ (ঈশ্বর) — কাম ক্রোধাদিতে মন চঞ্চল হয়। আবার কখন উত্তম আহারাদিতে মন যায়।

শ্রীমহাপুরুষ — কি করবে? শরীর থাকলে অমন হয়। প্রার্থনা কর সর্বদা — ভক্তি বিশ্বাস দাও, মন তোমার পায়ে টেনে নাও, প্রভো! (মতির প্রতি) বেশ তো হাওয়া চলছিল — দরজাটা বন্ধ করলে কেন? খুলে দাও — হাওয়া চলুক।

মতি — ঝাঁট দেব ঘর, ধূলো উড়বে তাই বন্ধ ছিল।

দরজা খুলিয়া দিতেই সজোরে হাওয়া চলিতে লাগিল।

শ্রীমহাপুরুষ উঠিয়া নিজ কক্ষের দিকে আসিতেছেন। স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দও সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন।

শ্রীমহাপুরুষ বলিতেছেন, এতকাল মহারাজের সঙ্গে রইলে, এঁদের ভালোবাসা পেয়েছ — সব ঠিক হয়ে যাবে। এঁদের ভালবাসা ব্যর্থ হয় না। তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া খাটে উপবিষ্ট হইলেন, জামা খুলিতেছেন। এবার বিশ্রাম করিবেন। স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ সঙ্গে সঙ্গে দোরগোড়া পর্যন্ত গেলেন।

একজন সাধুর কর্ণে ‘এঁদের ভালবাসা ব্যর্থ হয় না’ — ভরসার এই মহাবাণী বহুক্ষণ ধরিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল। হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া প্রশ্ন তুলিল, তুমি কি এঁদের কারো ভালবাসা পেয়েছ? শুদ্ধ মন উত্তর করিল, পেয়েছ বই কি! নইলে এই সাধুজীবন লাভ হল কি করে?

শ্রীম — মুক্তেশ্বরানন্দ কে? হাঁ, ঈশ্বর। গদাধর আশ্রমে বলেছিল, মহারাজের (ব্রহ্মানন্দজীর) ভালবাসা টেনে ঘর ছাড়িয়ে নিয়ে এল ষোল বছর বয়সে। বলেছিল, — প্রাণটা খালি চায় ভালবাসা। মহাপুরুষকেও তাই বললো। আহা, কি দৈবী ভালবাসায় বেঁধেছিলেন রাখাল মহারাজ ছেলেদের। অবতার এসেছেন বলেই এই শুদ্ধ পবিত্র ভালবাসা দেখা যাচে ছ। মহাপুরুষদের ভালবাসা অবিনাশী। তাঁদের ভালোবাসা পেলেই ভগবানের ভালবাসা পাওয়া গেল।

৩

আবার ডায়েরী পাঠ হইতে লাগিল।

বেলুড় মঠ। আজ ১৭ই জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, মঙ্গলবার। শ্রীমহাপুরুষের কক্ষ। শ্রীমহাপুরুষ খাটে বসিয়া আছেন। সকাল সাড়ে ছয়টা। সাধুরা প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার শরীর একটু খারাপ। স্বামী ওঁকারানন্দ পশ্চিম-দক্ষিণ জানালার সামনে দাঁড়াইয়া আছেন। আর একজন সাধু প্রবেশ-দরজার গোড়ায় ইজি-চেয়ারের পাশে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান। প্রণামের সময় এই সাধুকে অতিশয় করুণামাখা স্বরে বলিলেন, ভাল আছ? (সহাস্যে ওঁকারানন্দের প্রতি) — এঁর মাথাটা একদিকে একটু উঁচু। সাধু বলিলেন, পেছনে। উনি উত্তর করিলেন, না, না, বাঁ দিকে। কে জানে কত রকম আছে?

শ্রীমহাপুরুষ উঠিয়া পা টিপিয়া বারান্দায় যাইতেছেন।

আজ ৮ ই জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার। শ্রীমহাপুরুষের শরীর দুই তিন দিন হইতে তত ভাল নয়। আজ টেম্পারেচার ৯৮৮ হইয়াছে। সাধুরা তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

এখন সাড়ে ছয়টা। মহাপুরুষ খাটে বসিয়া একটি সন্দেশ খাইতেছেন। সেবক বৈরাগ্যানন্দ পর্দা টানিয়া দিলেন যাহাতে ঘরে কেহ না আসে।

অফিসঘরে সেবক গঙ্গেশানন্দ ডাক্তার অমর মুখার্জীকে টেলিফোন করিয়া শ্রীমহাপুরুষের কথা জানাইতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ জলযোগ সমাপন করিয়া ধীরে ধীরে অফিসঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামী গঙ্গেশানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ডাক্তারকে বলেছিলে? উনি পাশের ঘর হইতে আসিয়া উত্তর করিলেন, আজ্ঞে হাঁ। বললেন, পূর্বের ঔষধই repeat (আবার সেবন) করতে। আজকাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইতেছে।

শ্রীমহাপুরুষ সেবকদের বলিতেছেন — না, আজ আর অন্ন খাব না। পলতার ঝোল আর দুধ-বার্লি খাব। ডাক্তারকে জানিয়ে দাও।

স্বামী গঙ্গেশানন্দ — আপনি কি একটা হরিণের চামড়া ট্যান করতে দিয়েছিলেন?

শ্রীমহাপুরুষ — না, আমি দিই নি — মনে পড়ে না।

স্বামী গঙ্গেশানন্দ — অদ্বৈত আশ্রমের ম্যানেজার দ্বিজেন (স্বামী ধীরাত্মানন্দ) বললে আপনি দিয়েছেন, আর অসীমানন্দজীর মারফৎ চামড়াটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে পাঁচ টাকার বিল পাঠিয়েছে।

শ্রীমহাপুরুষ (বালকের ন্যায় সহজ ও সরস ক্রোধে) — আমি দিই নি — আমার দরকারও নেই — টাকাও দেব না। যার দরকার টাকা দাও আর ওটা নাও (মধুর হাস্য)।

স্বামী মনীষানন্দ (মতি) দরজার পাশে দাঁড়াইয়া অনুমতি চাহিতেছেন, কলিকাতা যাইবেন। শ্রীমহাপুরুষ ঘাড় ও মুখ উঁচু করিয়া বলিলেন, বাবা, আজকাল আমি কিছু জানি না (সরল হাস্য)।

ডায়েরী পাঠ শেষ হইল।

শ্রীম (উদ্দীপিত হইয়া সকলের প্রতি) — আপনারা পুরী যাচেছন তো? আহা, যাবেন বই কি। অমন মহোৎসব রথ! কত ভক্ত যাবে।

একজন ভক্ত — যেতে ইচছা হয়, কিন্তু অর্থের অভাব।

শ্রীম (রহস্যচছলে) — সে কী। রথে ভগবানদর্শন, অত ভক্ত সমাগম। 'Beg, borrow or steal' — (ভিক্ষা কর, নয়ত ধার কর, নয় চুরি কর) ওরা বলে। যে ভাবেই হোক কার্যসিদ্ধি করা উচিত (ঈষৎ হাস্য)।

শ্রীম (কৌতুকচছলে) — আপনি চুরি করেন না? (উচচ দীর্ঘ হাস্য)। আগে 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' তাঁকে দর্শন। তারপর তিনি — 'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি' (করবেন) (গীতা ১৮ -৬৬)।

শ্রীম (ঐ ভক্তের প্রতি) — গভর্নমেন্ট আফিসে sick-leave notice (অসুখের জন্য ছুটির দরখাস্ত) দিলেই হয়, না (হাস্য)?

ভক্ত — হাঁ। আমাদের মার্চেন্ট আফিসে ওতে হয় না।

শ্রীম (সতীনাথের প্রতি) — আপনি স্নানযাত্রায় গেলেন না?

সতীনাথ — যাবার ইচছা ছিল, কিন্তু বাবা টাকা দিলেন না।

শ্রীম (সহাস্যে) — আগে ধার করে কার্যসিদ্ধি করতে হয়, তারপর শোধের চেষ্টা। আগে কার্যসিদ্ধি।

এতক্ষণ শ্রীম ফষ্টিনষ্টি করিতেছিলেন। কথা কহিতেছেন half in jest half in earnest! (কৌতুক ও দৃঢ়তার সহিত)। এবার গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন।

শ্রীম (গম্ভীরভাবে সকলের প্রতি) — ঠাকুর বিশ বছর ছিলেন ওখানে (পুরীতে) — চৈতন্যদেব। ঠাকুর বলতেন কি না, 'আমিই চৈতন্যদেব'। তাই তিনি নিজে যেতেন না, ভক্তদের পাঠিয়ে দিতেন। গেলে মহাভাবে

শরীর যেতে পারে পূর্বকথা স্মরণ করে। তাই যেতেন না। আমাদের পাঁচ ছয়বার পাঠিয়ে ছিলেন।

একটি বিশ-বাইশ বছরের ছাত্রের প্রবেশ।

শ্রীম (ছাত্রের প্রতি) — এই, আপনি যাচেছন তো? (ছাত্রটি তো হতভম্ব)। এঁরা সব অনেকে পুরী যাচেছন। আপনিও যাচেছন তো? আপনি যেকালে এসে পড়েছেন, আপনাকে নিশ্চয় তিনি টানছেন। আমরা ছোট বেলায় শুনেছিলাম — জগন্নাথ না টানলে যাওয়া যায় না। আপনার যাওয়া হবে। এই ক'দিন তো? আবার কনসেসান দিচেছ।

ছেলেটি মৌন। মনে হইতেছে, তাহার ইচছা আছে, কিন্তু অসুবিধাও আছে।

একজন সাধু — মঠ থেকে অনেকে যাচেছন।

শ্রীম — তা যাবে না? মনে কর, কত বড় নেমন্তন্ন! বাড়ির কড়াইয়ের ডাল তো রোজই আছে।

একজন সাধু (স্বগতঃ) — ঠাকুর বলতেন, অমৃতসাগরে ইচছা করেই পড়, আর ধাক্কা খেয়েই পড় — ফল এক, অমৃতত্ত্বলাভ। এঁরা দেখছি উত্তম বৈদ্য — ধাক্কা মেরে ফেলে দেন। মানুষের মনকে ঈশ্বরের দিকে নেবার কত কৌশলপ্রয়োগ! একেই বুঝি বলে 'সা চাতুরী চাতুরী'।

সন্ধ্যা। শ্রীম তুলসীতলায় ধ্যানমগ্ন।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
১৯শে জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার।

দ্বাদশ অধ্যায়

পুরীর মহিমা

১

আজ ২১শে জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। মর্টন স্কুল। পঞ্চাশ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীট। তিনতলার বারান্দা। গ্রীষ্মকাল। এখন পাঁচটা। আজ দারুণ গরম। শ্রীম বারান্দার পূর্বপ্রান্তে বসিয়া আছেন। দৃষ্টি পূর্বদিকে, আকাশে। উদাস ভাব। চোখ মুখ শুষ্ক। শ্রীম-র পরনে সাদাপাড় ধুতি। গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবী। বেলুড় মঠ হইতে অন্তেবাসী আসিয়াছেন। প্রণাম করিলেন যুক্ত করে। সাধুদের শ্রীম পায়ে হাত দিতে দেন না। এমনকি, কাহাকেও দেন না।

জ্যৈষ্ঠ মাস। পৃথিবীকে যেন আজ তপ্ত কড়াইয়ে ভাজা হইতেছে। গরমে বড় কষ্ট হয় শ্রীম-র। অন্তেবাসীকে বলিলেন, চলুন উপরে ছাদে যাওয়া যাক।

শ্রীম চেয়ারে বসিয়াছেন ছাদে উত্তরাস্য। একটু একটু হাওয়া চলিতেছে। শ্রীম আনন্দে বলিতেছেন, এই হাওয়াটি পাওয়াতে বেঁচে গেলাম। শ্রীম বাম হাতে ডান হাতের নাড়ী টিপিতেছেন। আর বলিতেছেন — ঠাকুর বলেছিলেন, 'মাকে বিশ্বাস কর। তা হলে আর কিছু করতে হবে না।' 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি।'

অন্তেবাসী — ডায়েরী রয়েছে। আপনাকে শোনাবার জন্য এনেছি। এখন কি শুনবেন?

শ্রীম (আনন্দে) — হাঁ, পড়ুন পড়ুন।

অন্তেবাসী ডায়েরী পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন।

আজ ২১শে জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। বেলুড় মঠ। কয়দিন শ্রীমহাপুরুষ অসুস্থ — ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছে। সকালে শরীরের তাপ ৯৮ ; বিকালে বৃদ্ধি হয়, ১০০.৬—১০১ হয়। তবুও সাধুরা সকালে প্রণাম

করিতে আসেন। তখন যেন জ্বর নাই — নূতন মানুষ, ঠিক আচার্য, পরমহংস! সকলের কুশল প্রশ্ন করেন আনন্দে।

ঘরে এখন স্বামী নিগমানন্দ দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি গয়াতে ঠাকুরের আশ্রম করিয়াছেন। গয়ার আশ্রমের কথা মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। স্বামী পরমানন্দও গয়ায় থাকেন, cave-এ (গুহাতে)। তাঁহার কথা উঠিল। শ্রীমহাপুরুষ বলিতেছেন, সে চেলা করে না? ন্যাংটাবাবার চেলা বলে তাকে মানে লোক। ন্যাংটাবাবাকে সকলেই খুব মানতো। সে (রাখাল) মহারাজের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। প্রথমে ন্যাংটাবাবার কাছে উপদেশ পায়, পরে মহারাজের কাছে।

দেওঘর বিদ্যাপীঠের একজন সাধু প্রণাম করিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছ? আনমনা ভাব, অসুস্থ। (সহাস্যে) আবার তো যেতে হবে ওখানে? সাধু উত্তর করিলেন, আজ্ঞে হাঁ। আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কবে? সাধু বলিলেন, কাল। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, (সত্যাগ্রহ) গোলমালের জন্য পিম (স্বামী জ্যোতিরূপানন্দ) টাকা কড়ি পায় নি কিছুই।

‘পিম’ বিদ্যাপীঠের জন্য বিহারের মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানের অর্থ-সংগ্রাহক। এবার গান্ধীজীর দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্য অর্থসংগ্রহ হয় নাই।

ডায়েরী পাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী মনীষানন্দের প্রবেশ। নমস্কারাদির পর শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কর্মস্থল কোথায়? (অন্তেবাসীকে দেখাইয়া) এঁর মাদ্রাজে ছিল। এখন দেওঘরে (বিদ্যাপীঠে) transferred (বদলী) হয়েছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — এই কর্মের অধ্যক্ষ কে, জানেন? — ঈশ্বর। তাই ঠাকুর বলেছিলেন, মাকে অর্থাৎ কর্মাধ্যক্ষকে বল। তাহলে সব কমিয়ে দেবেন।

কর্ম করতে হবে। ‘প্রকৃতি স্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি’ (গীতা ১৮ -৫৯)। আর একরকম আছে, যারা নিজেরা কর্তা। তাদের কথা আলাদা। মাঝে মাঝে নির্জনে সকলেরই যাওয়া দরকার।

অন্তেবাসী — অনেক দিন comforts-এর (আরামের) ভেতর থেকে শেষে যেতে কষ্ট হয়। শরীরে সয় না।

শ্রীম — আপনার যেতে হবে না। যাদের শরীর খারাপ তাদের জন্যই তো মঠ। পাখী আকাশে পরিশ্রান্ত হয়ে ডালে বসে বিশ্রাম করতে। তেমনি মঠ।

অন্তেবাসী — তা হলে আর ফার্স্ট ক্লাস (সাধু) হওয়া গেল না। সেকেণ্ড — থার্ড ক্লাস হল।

শ্রীম — না। ওঁর (ঈশ্বরের) দিক থেকে সেকেণ্ড, থার্ড নেই — 'নাদত্তে কস্যচিদ্ পাপম্'। আর সেকেণ্ড, থার্ডও ফার্স্ট হওয়ার জন্যই। তা না হলে 'অনন্য চিন্তয়ন্তঃ' করতে গেলে যে চলবে না।

কচছপ আকাশে উড়তে গিছলো। কিন্তু পড়ে চুরমার হয়ে গেল। ঈগল কিন্তু বারণ করেছিল, তবুও উড়তে চাইলে।

একটা কচছপের বড় সাধ সে আকাশে ওড়ে। তার ছিল বন্ধুত্ব একটা ঈগলের সঙ্গে। ঈগল সর্বদা ওড়ে। একদিন পীড়াপীড়ি করায় ঈগল বললে, আচছা তুমি এই কাঠিটা কামড়ে ধরে থাক। আমি এটাতে করে তোমায় নিয়ে যাব। খানিকটা উড়েছে। তখন কচছপের কথা কইতে ইচছা হল। যে-ই বলা, অমনি নিচে পতন। তার দফা রফা হয়ে গেল।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — আপনার একটা জায়গায় স্থির হয়ে বসা উচিত। যাদের নিজেই 'যোগক্ষেম' বইতে হয় তাদের 'অনন্যশ্চিন্তয়ন্ত' হয় না।

একজন সাধু (স্বগতঃ) — আমার বাসনাও তাই — একস্থানে স্থির হয়ে বসি — কাশী কিম্বা পুরীতে। মহাপুরুষ মহারাজ কিংবা মাস্টার মশায়কে জিজ্ঞাসা করার ইচছা ছিল। অযাচিতভাবেই উত্তর মিলে গেল।

শ্রীম (একটু ভাবনার পর) — কনখলে যখন ছিলাম, তখন হরি মহারাজের (স্বামী তুরীয়ানন্দ) সঙ্গে বিকালে নানা আশ্রমে বেড়াতাম।

আজ শনিবার বলিয়া বহু ভক্ত আফিসের ফেরৎ আসিয়াছেন। কয়েকদিন পর পুরীতে রথযাত্রা। শ্রীম কিছুদিন হইতে পুরীর কথাই ভাবিতেছেন। ভক্তদের জোর করিয়া রথোৎসবে পাঠাইতে চেষ্টা করিতেছেন। যিনি আসিতেছেন তাঁহাকেই পুরী যাইতে বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, 'আমি আর চৈতন্যদেব এক।' তিনি পুরীতে প্রায় বিশ বছর ছিলেন। (ঠাকুর) ভক্তদের জোর করে

পাঠিয়ে দিতেন। নিজে যান নি। তাহলে শরীর থাকবে না, পূর্বাবতারের সব কথা স্মরণ হলে। তাই ভক্তদের পাঠিয়ে সব সংবাদ নিতেন।

যান না আপনারা। ফস্ করে একবার দেখে আসুন না, এই কয়দিন বই তো নয়। হয়তো দুই তিন দিন।

টোটা গোপীনাথ, সিদ্ধবকুল, গম্ভীরা, সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর — এই সব দর্শন করতে বলতেন। আর জগন্নাথ।

আমরা পাঁচ ছ' বারেরও বেশী গিয়েছি। একবার তিন উইক (week—সপ্তাহ) ছিলাম এক পাণ্ডার বাড়িতে। নির্জন বাড়ি, ঝাঁটপাট নেই। সাপের ভয় হতো। মশারী বিছানায় গুঁজে দিতাম। কি জানি কেন, এতে আমার অত nervousness (ভয়ের দুর্বলতা) হতো। মহাপ্রসাদ কিনে খাওয়া। ওতে কোনও গোলমাল ছিল না, চেষ্টাও ছিল না।

ঠাকুর বলেছিলেন, 'অনেক টাকা সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো'। আহা, কত ভাবতেন! লোকবল নেই — অর্থবল থাকলেও অনেক। আর বলেছিলেন, 'জগন্নাথকে আলিঙ্গন করবে।' এক একবার বলতেন, 'পুরীতে জগন্নাথও আমি।'

নরেন্দ্রকে (স্বামী বিবেকানন্দ) — বলেছিলেন, 'নদের গৌরের নাম শুনেছিস্, সে-ই আমি।' নরেন্দ্রের তখন বছর উনিশ বয়স। নরেন্দ্র এসে আমাদের বললেন এই কথা। আর বললেন, 'লোকটা পাগল হয়েছে না কি? বলে কি আমি নদের গৌর!' আবার আমায় বললেন, কাউকে বলবেন না এ কথা (হাস্য)।

আবার গীতায়ও তাই বলেছেন, 'বহূনি মে ব্যতীতানি' (গীতা ৪-৫) — কিন্তু তুমি তা জান না। আমি সব জানি।

ভাটপাড়ার ললিত রায়ের প্রবেশ।

শ্রীম (ললিতের প্রতি) — এই যে ললিতবাবু এসেছেন। যান না একবার পুরী ঘুরে আসুন, রথ।

ললিত — থাকার স্থান যে নেই।

শ্রীম — কেন? শশী নিকেতনে থাকবেন। বলরামবাবুদের বাড়ি। জোর চলে। এ্যাটিকেট — ভদ্রতা আবার কি? (মৃদু হাস্য) (যদি বলে) 'যাও যাও' (তখন বলবেন) আমি যাব না। শুয়ে পড়লাম (দীর্ঘ হাস্য)।

ঠাকুর বলেছিলেন, ‘দু’রকম লোক আছে একরকম optimistic (আশাবাদী) উঠে পড়ে লাগে। কোন বাধা মানে না। আর এই pessimistic (নিরাশাবাদী)। তাদের আঠার মাসে বছর, বলতেন। তারা সাত পাঁচ ভাবে — কোথায় থাকবে, সুবিধা হবে কি না — এই সব ভাবনা ভাবে।

একটি সাধু (স্বগতঃ) — ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ। শ্রীম তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ — তাঁর এক কলা শক্তির আধার। শ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে তাঁর শরীর মন পবিত্র। আমিও শ্রীম-র পাদস্পর্শ করে পবিত্র হব।

সন্ধ্যা হইয়াছে। শ্রীম উঠিয়া তুলসীতলায় যাইবেন। একটি সাধু অন্ধকারে হঠাৎ ভূলুণ্ঠিত হইয়া শ্রীম-র পাদস্পর্শ করিলেন। শ্রীম দেখিয়াও বাধা দিলেন না আজ।

বিস্তৃত ছাদের উত্তরাংশে তুলসীকুঞ্জ। উহা কুসুমকাননের একাংশ। ইদানীং শ্রীম-র ইচ্ছায় উহা রচিত হইয়াছে। তুলসীকুঞ্জে বসিয়া শ্রীম ধ্যান করিতেছেন উত্তরাস্য। চারিদিকে ভক্তগণও ধ্যানমগ্ন।

অন্তেবাসী (স্বগতঃ) — ঠাকুর এক সময়ে তুলসীকুঞ্জে ধ্যান করিতেন। শ্রীম বুঝি তাহারই অনুকরণ করিতেছেন।

২

ধ্যানান্তে শ্রীম ছাদের দক্ষিণ দিকে আসিয়া বসিলেন মাদুরের উপর উত্তরাস্য। ভক্তগণ বসিয়াছেন কম্বলে শ্রীম-র সম্মুখে। এখন রাত্রি সাড়ে আটটা। চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ চলিতেছে — মধ্যখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, রথাগ্রে নর্তন। হিমাংশু প্রথমে পড়িলেন, তারপর ভাটপাড়ার ললিত। শ্রীম যুক্ত করে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুনিতেছেন।

মহাপ্রভু ভক্তগণকে সাতটি দলে বিভক্ত করিলেন। প্রত্যেক দলের এক একজন দলপতি। তাঁহারা রথাগ্রে কীর্তন করিয়া চলিয়াছেন। স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য একদলে নৃত্যরত। তিনি নৃত্যানন্দে বিভোর। তেমনি অপর দলে নৃত্য করেন নিত্যানন্দ। অদ্বৈত, হরিদাস, বক্রেশ্বর — ইঁহারা নৃত্য করিবার আদেশ পাইলেন মহাপ্রভুর নিকট হইতে। রথের অগ্রে চার দল — তাহাদের দলপতি স্বরূপ, শ্রীবাস, মুকুন্দ ও গোবিন্দ।

রথের দুই পার্শ্বে দুই দল — কুলীনগ্রামের ভক্তগণ এক দলে। অপর পাশের দলে অদ্বৈতের অনুচরগণ। রথের পিছনে এক দল। সাত দলে চৌদ্দ মাদল বাজিতেছে, নৃত্য আর উচ্চকীর্তন চলিতেছে। মহাপ্রভুর অশ্রুকম্প স্বেদপুলক হইতেছে। জগন্নাথ-নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেছেন না ভাবাবেশের তীব্রতায় — তাই গোঙ্গাইতেছেন — ‘জ জ’ ‘গ গ’ বলিয়া।

শ্রীম — সাত দলের দলপতিদের নাম বলুন তো?

পাঠক —স্বরূপ, শ্রীবাস, মুকুন্দ ও গোবিন্দ — এই চারজন রথাগ্রের দলপতি। আর তিন দলের দলপতিদের নাম নেই।

শ্রীম (সহাস্যে) — রথ অনেক স্থানে দাঁড়ায়। পাণ্ডারা বলে জগন্নাথের ইচ্ছায় দাঁড়ায়, আবার তাঁর ইচ্ছায় চলে। মডার্নরা বলে আমরা ইঞ্জিন বেঁধে চালাব, দেখি কেমন জগন্নাথের ইচ্ছায় চলে। পাণ্ডারা তখন জোড়হাত করে বলে, না বাবু, উ-টি করবেন না। আমাদের পাওনা তা হলে মাটি হবে। ইঞ্জিন কি জগন্নাথের ইচ্ছায় হয় নি? তিনি যে সর্বঘটে বুদ্ধিরূপে অবস্থান করছেন — ‘যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা’!

পাঠ আবার চলিতেছে। শ্রীনিবাস হরিচন্দনকে ভাবাবেশে চড় মারিয়াছেন। কেন না, তিনি শ্রীনিবাসের গায়ে হাত দিয়া ঠেলিয়া দেন বারবার। তাহাতে ভাবাবেশে ক্ষুব্ধ হইয়া চড় মারেন। হরিচন্দন আর রাজা প্রতাপরুদ্র দাঁড়াইয়া মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করিতেছিলেন। শ্রীনিবাস আসিয়া রাজার সামনে দাঁড়ান। তাই তাঁহাকে ঠেলিয়া দেন যাহাতে রাজা দেখিতে পারেন। হরিচন্দন রাজমন্ত্রী। তিনিও ক্ষুব্ধ হইয়া শ্রীনিবাসকে অপমান করিতে প্রস্তুত দেখিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে বারণ করেন। বলেন, তুমি ভাগ্যবান, চৈতন্যপার্ষদের হস্তস্পর্শ পাইলে। আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিল না।

শ্রীম — প্রতাপরুদ্র রাজা। তাঁকে দর্শন দেন নি কেন এত দিন? এইজন্য — রাজাকে ভজনা করা মানে, ঐশ্বর্যকে ভজনা করা। বিষয়ীর শ্রেষ্ঠ রাজা। কিন্তু আজ তাঁর ভাগ্যোদয় হল।

সার্বভৌম, কাশীমিশ্র প্রভৃতির উপদেশে রাজা আজ দীনবেশে রথাগ্রে ঝাড়ু দিতেছেন আর চন্দন-জল রাস্তায় ছিটাইতেছেন। আর ভাগবতের

গোপীগীতা আবৃত্তি করিতেছেন —

তব কথামৃতম্ তপ্তজীবনম্ কবিভিরীড়িতম্ কল্মষাহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্ ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগীতা)

মহাপ্রভু এই গীত শুনিয়া উন্মত্তবৎ গিয়া রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন। এটা হয়েছিল শেষে। কিন্তু পূর্বে একবার ভাবাবেশে দর্শনরত রাজাকে আলিঙ্গন করিতেই ভাব ভঙ্গ হইয়া গেল। ধিক্কার দিয়া নিজেকে বলিতে লাগিলেন — 'ছি, ছি, বিষয়ীর স্পর্শ হইল আমার।' মহাপ্রভু বেহুঁশ হইয়া রথাগ্রে পড়িয়া যাইতেছেন। রাজা তাঁহাকে ধরেন। তাই ধিক্কার দিয়া এই কথা বলিলেন। আর নিত্যানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দাদি ভক্তজনকে দোষ দেন — কেন তাঁহারা তাঁহার পার্শ্বরক্ষা করেন নাই। তবে রাজা ধরিতে পারিতেন না।

সার্বভৌম রাজাকে প্রবোধ দেন। বলেন, আপনার উপর কৃপা হইয়াছে।

শ্রীম — ভক্তদের শিক্ষার জন্য কেবল এই বিষয়নিন্দা আর রূঢ় কথা বললেন। দীন না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। তাই বাইবেলে আছে, "Blessed are the poor, for they shall see God." (অন্তরে যারা দীন তারা ধন্য — ঈশ্বর তাদেরই দর্শন দেন।)

আবার আছে, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. (Math—18/3) (শিশুর মত দীন নিরহঙ্কার না হলে ধর্মরাজ্যে প্রবেশ অসম্ভব)।

ললিতের বয়স প্রায় পঞ্চান্ন। চশমা ছাড়া পড়িতে তাঁহার কষ্ট হইতেছে। অমৃত তাই অপর একজনের চশমা আনিয়া দিলেন। শ্রীম বাধা দিয়া বলিলেন, না, এতে attenion diverted (মনোযোগ ব্যাহত) হয়ে যায়। পাঠের সময় disturbance (গোলমাল) না হয়।

এই টোটায় একবার মহাপ্রভু বিশ্রাম করছিলেন। তখন রাজা প্রতাপরুদ্র গিয়ে পদসেবা করেন। রথের পূর্বে, গুণ্ডিজামন্দির মার্জন করেন স্বগণসহ মহাপ্রভু। তারপর 'পকাল' অর্থাৎ পান্তা প্রসাদ খেয়ে বিশ্রাম করেন।

একজন সাধু — আজকাল রামদাস বাবাজী ঐরূপ মার্জনা করেন,

আর আইটোটায় পান্তা প্রসাদ খান সকলে। আমিও একবার ওঁদের সঙ্গে থেকে গুণ্ডিজা মার্জনা করেছিলাম।

শ্রীম (অতি আনন্দে ভক্তদের প্রতি) — এই দেখুন, ইনি গুণ্ডিজা মার্জন ও আইটোটার পান্তা মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করেছিলেন। যান না, আপনারাও করে আসুন না একবার।

পাঠ চলিতেছে। গোপীগণের অহেতুক কৃষ্ণপ্রেমের কথা হইতেছে। ব্রজ ছাড়িয়া মথুরায় কৃষ্ণ চলিয়া আসিলে শ্রীরাধাপ্রমুখ গোপীগণ বিরহকাতর। সংবাদ পাঠাইয়াছেন — তুমি আসিয়া ব্রজাঙ্গনাগণকে জীবিত কর। তাহারা অর্ধমৃত।

শ্রীম — আহা, কি প্রেম! সংসার ভুল হয়ে গেছে! মৃতের মত গোপীগণ কৃষ্ণবিরহে। তাই তো ঠাকুর গোপীদের অত মান দিতেন। বলতেন, তাদের প্রেমের এককণা পেলে হেউ ঢেউ হয়ে যায়।

উদ্ধবকে এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে পাঠান। বলছেন — যাও, যাও উদ্ধব, গোপীদের সংবাদ নিয়ে এস। আমাকে যখন কেউ জানতো না, তখন এরা ভালবেসেছে। তাদের ঋণ আমি শোধ করতে পারি না। তাইতো মহাপ্রভু বলতেন নিজেকে — 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োঃ দাসদাসানুদাসঃ।' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দাসের দাসানুদাস আমি।

শ্রীম চৈতন্যকৃত সম্পূর্ণ শ্লোকটি আবৃত্তি করিতেছেন —

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপিবৈশ্য ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে
গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।।

শ্রীম — শ্রীরাধার ভাবে মহাভাবগ্রস্ত শ্রীচৈতন্যদেব। শেষের দ্বাদশ বৎসর এই একটানা মহাভাবে বিলীন ছিলেন গম্ভীরায়। এইসব ভাবের স্পর্শ এখনও রয়েছে পুরীতে। যান না, যান একবার হয়ে আসুন।

এখন রাত্রি প্রায় নয়টা। সাধু ও ভক্তরা শ্রীমকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

বেলুড় মঠ। ২১শে জুন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার।